Online ISSN-2584-0851

# উত্তরন

শারদ সংখ্যা - ২০২৫

Growing Seed, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা

লগঅন করুন : www.growingseed.in/uttaran
ই-মেল : seedgrowing@gmail.com
ফেসবুক : facebook./growingseedinfo
টুইটার : @growingseed1
ইউটিউব : Growing Seed
ইনষ্টাগ্রাম : growingseed1

(বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনো দায় ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষের নয়।)

**UTTARAN**
Edited by : Growing Seed
Rs.50

পঞ্চদশ প্রকাশ ঃ
২৮-০৯-২০২৫

প্রকাশ ঃ
Growing Seed Printing Unit
চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, উঃ ত্রিপুরা।

বর্ণসংস্থাপন ঃ
সুজিত দাস

প্রচ্ছদ ঃ
অনুপম ভট্টাচার্য্য (হেপ্লয়েড এডভ্যাটাইজিং, বরোদা, গুজরাট)

মূল্য ঃ
৫০ টাকা মাত্র

# সম্পাদকের কলমে-

মানুষের জীবন এক অনন্ত যাত্রা। এই যাত্রায় আমরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা পথ ধরে এগোই, কিন্তু গন্তব্য এক। এই মৌলিক সত্যটি যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন স্পষ্ট হয় যে অহংকার, বিভেদ কিংবা প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতা, সহমর্মিতা আর মানবিকতার চর্চাই আমাদের প্রকৃত শক্তি।

সাহিত্য ও বিনোদনের জগৎ আমাদের সেই শিক্ষা বারবার দেয়। গল্প-উপন্যাসে কিংবা নাটক-চলচ্চিত্রে আমরা দেখি, মানুষের হৃদয়ের উন্মোচন তখনই ঘটে, যখন সে অন্যের যন্ত্রণাকে নিজের মতো অনুভব করতে পারে। কবিতা আমাদের শেখায় কেমন করে এক ফোঁটা শিশির বিন্দুতেও জড়িয়ে থাকে বিশ্বজনীন সত্য, আর সংগীত আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সুরের ভেতরে কোনো প্রাচীর নেই, সবই মিলেমিশে একাকার।

আজকের সময়ে, যখন সামাজিক ও ব্যক্তিগত বিভাজন ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে, তখন প্রয়োজন আরো বেশি সংলাপ, সহমর্মিতা এবং পারস্পরিক সহায়তা। আমাদের প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি কাজ আমাদের ভেতরের মনোভাব প্রকাশ করে। আমরা যদি ভ্রাতৃত্ববোধ নিয়ে হাত বাড়াই, তবে সেই স্পর্শই অন্যের জীবনে আলো হয়ে জ্বলে উঠতে পারে। আবার আমরা যদি স্বার্থপরতা কিংবা বৈরিতায় অন্ধ হই, তবে আমাদের ছায়াও অন্যকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়।

এ কারণেই প্রয়োজন সমবায় মনোভাব। পরিবারে, সমাজে, কর্মক্ষেত্রে; সবখানেই সহযোগিতার চর্চা আমাদের জীবনকে সহজ করে তোলে। সাহিত্য যেমন মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে, তেমনি আমরা প্রত্যেকে যদি জীবনে সেতুবন্ধনের স্থপতি হতে পারি, তবে সমাজে সৌহার্দ্যের আবহ জন্ম নেবে।

আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত, গন্তব্য নিশ্চিত। কিন্তু পথচলাটা কেমন হবে;এটা নির্ভর করছে আমাদের আচরণের ওপর। আমরা চাই সেই পথ হোক আলোকিত, মানবিকতার সুবাসে ভরপুর। তাই আসুন, এই সাহিত্য ও বিনোদনের পাতার মাধ্যমে আমরা প্রতিজ্ঞা করি;অন্যকে পাশে নিয়ে চলব, সহযোগিতায় গড়ব আগামী দিনের সুন্দর পৃথিবী।

সম্পাদক

# Complete Printing and

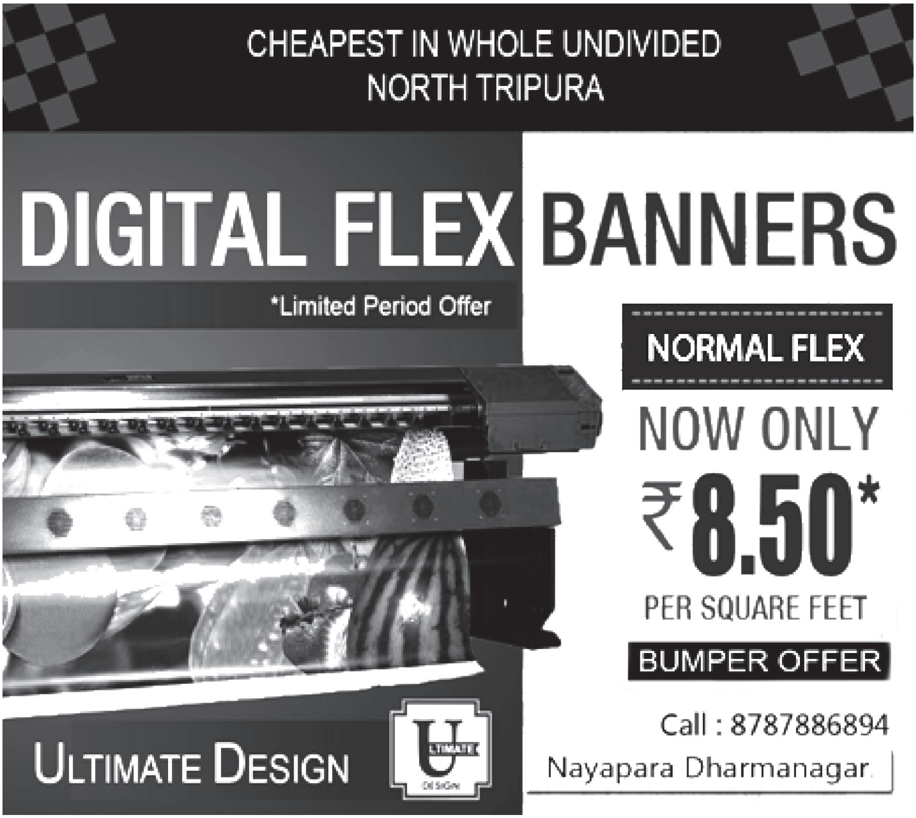

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখকের নাম | ক্রমাঙ্ক |
|---|---|---|
| ☛ রবীন্দ্র চেতনা ও আধুনিক বাংলা কবিতা | বিধানচন্দ্র দে | ১ |
| ☛ দুঃখ বলে রইনু চুপে | মধুপর্ণা নাথ | ৭ |
| ☛ অঙ্গীকার | শিউলি শর্মা | ১০ |
| ☛ শারদ আনন্দ | সুপর্ণা ভট্টাচার্য | ১০ |
| ☛ একা | নীলোৎপল গোস্বামী | ১০ |
| ☛ বন্ধু | পারমিতা চৌধুরী | ১১ |
| ☛ জয় মা | দীপালোক ভট্টাচার্য্য | ১৩ |
| ☛ ভাঙা দরজা | সাগর শর্মা | ১৩ |
| ☛ কে হবে | শিবানী পাল | ১৩ |
| ☛ পাহাড় ডাকে আমায় | দীনবন্ধু সেন | ১৪ |
| ☛ সাহিত্যের উপজীব্য পলাশ ও তার ভেষজ ব্যাপ্তি | অভিজিৎ ভট্টাচার্য | ১৭ |
| ☛ স্পিনট্রনিক্স : ভবিষ্যতের প্রযুক্তির নতুন দিগন্ত | পায়েল ভট্টাচার্য | ২১ |
| ☛ সম্পর্ক | সুপর্ণা ভট্টাচার্য | ২৩ |
| ☛ কহিলে কথা কালী, আমরা কি তা বুঝতে পারি ? | দধীচি | ২৪ |
| ☛ চলো আকাশ হয়ে যাই | মিতালী দে | ৩০ |
| ☛ নিশীথ প্রদীপ | অস্মিতা দে | ৩০ |
| ☛ অভিনয়ের জীবন | অনন্যা ভট্টাচার্য | ৩১ |
| ☛ শান্তি | অপরাজিতা নাথ | ৩১ |
| ☛ প্রি জাজমেন্ট | কপিল দেব | ৩২ |
| ☛ চাঁদের কাছে চাওয়ার ছিল | দৃপ্ত নাথ | ৩৬ |
| ☛ স্রোতের প্রতিকূলে | সুকান্ত দাস | ৩৬ |
| ☛ সুচরিতা, চিরপরিচিতা | সুদীপ্ত চক্রবর্তী | ৩৭ |
| ☛ সেই মেয়েটি | বিশাখা অধিকারী | ৩৭ |
| ☛ জিতে গিয়েও, হেরে যাওয়া | অনিন্দিতা দেবনাথ | ৩৮ |
| ☛ ব্যাকডেটেড | দীপাঞ্জন পাল | ৩৯ |
| ☛ আধুনিক যুগে যোগ ও ধ্যানের গুরুত্ব | প্রসেনজিৎ দেবনাথ, অঙ্কন সিনহা, সুকান্ত চন্দ্র নাথ, প্রিয়জিৎ দেবনাথ | ৪০ |
| ☛ ছোট মুখে বড় কথা | রণজিৎ পুরকায়স্থ | ৪২ |

# AGRIALLIS

Science for Agriculture and Allied Sector: A Monthly e Newsletter

A National Level Peer Reviewed e Magazine
on
Agriculture and Allied Sciences.

An Initiative Supported by

GROWING SEED

www.agriallis.com

# রবীন্দ্র চেতনা ও আধুনিক বাংলা কবিতা

বিধানচন্দ্র দে

রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজ ও আধুনিক কবি সমাজ নামে যে দুই গোষ্ঠির কল্পনা করে থাকেন তার উদ্ভব প্রকৃত পক্ষে রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কালের প্রান্তসীমায়। যদিও এই দুই নামে কবিদের সমাজ বিভাগ কতখানি যুক্তিসহ সে প্রশ্ন আজও অমীমাংসিতই থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাসুসারী কবি সমাজ বলতে সমালোচকেরা সেই সব কবিদের কথাই বুঝিয়ে থাকেন, প্রসঙ্গে প্রকরণে যাঁরা রবীন্দ্রলোকের অন্তবর্তী। এই কবি মণ্ডলী কাব্যের উপকরণিক চিরন্তনত্বে বিশ্বাস রাখতে গিয়ে মূল্যায়নের নিজস্ব ধর্মকে অস্বীকার করেছেন। অথচ উপকরণিক চিরন্তনত্ব বলে কাব্যের ইতিহাসে কোনও কথা নেই। ক্রমবর্ধমান আত্মসংবিতের আলোকে কবিমানস বারে বারে কাব্যের চিরন্তন মান নির্ণয় করে। এবং এই পথেই তাঁরা আধুনিকত্ব অর্জন করে। তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে বাংলা কাব্যের নতুন পর্যায়ের রেখাপাত হতে থাকলে রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য এই ক্ষেত্রে প্রথমে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আধুনিক কবিদের রচনা তার যাত্রারম্ভেই যে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো তার মূল কথা হলো 'এ কাব্য প্রথানুগত নয়'। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের সংকলনের নবম খণ্ডে হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্রে ইয়ুক্যালিপটাস গাছে কোকিল ডাকার সংবাদ জানিয়ে কবি বলেছেন যে কোকিলটা বোধহয় আধুনিক। সনাতনি কোকিল হলে সে বোধহয় বেছে নিতো আপন প্রেরণায় কাব্যখ্যাত বকুল। এই নির্দেয় পরিহাসের ভিতরে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম অভ্যর্থনার রূপ অনেকটা প্রতিবিম্বিত। অথচ ওই খণ্ডের পত্র সংকলনেই আর একটি সংবাদ কবি দিচ্ছেন যার তাৎপর্য তখনই বোঝা যায়নি। 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের পর 'পুনশ্চ' প্রকাশিত হলেও 'পুনশ্চে' রই প্রথম সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষিত হয়েছিলো। সে তুলনায় 'পরিশেষে'র বিক্রয় ছিলো অনেকটা ধীরগতি। প্রথম সংস্করণ তখনও অনিঃশেষিত। 'পুনশ্চ'রূপ প্রকরণগত অভিনবত্ব কাব্য-পাঠকদের আনুকূল্য অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এ সংবাদে বাঙালি কাব্য-পাঠকের মানসিক জাড্য সম্বন্ধে দুর্মর কিংবদন্তি অনেকটা শিথিল হয় বটে, কিন্তু তিরিশের আধুনিক কাব্যের উন্মেষ পর্বে অ্যাভারেজ বাংলা কাব্য-পাঠকদের বিমুখতার কথা ভাবলে সে আনন্দ অচিরে ম্লান হয়ে যায়।

অবশ্য এ বিমুখতার কারণ আধুনিক কবির অভিজ্ঞতার জটিলতা ও দুরূহতা। 'পুনশ্চোর প্রকরণগত নতুনত্ব নিঃসন্দেহে অভিনবত্বের স্বাদ দিয়েছে। কিন্তু আধুনিকতার অন্তর্দৃঢ় জটিলতাকে দেখায়নি। 'পুনশ্চ' 'শেষ সপ্তক', 'শ্যামলী', পত্রপুটের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি- 'বলাকা পর্ব এবং অন্তিম পর্ব অনেক বেশি আধুনিক কাব্য। আধুনিক কবিকে বিচারের কালে আমরা দেখি যে দৃশ্যমান, ক্রয়মাণ এবং অনুভূতিগম্য বাস্তবতাকে তিনি একই সঙ্গে দুই দিক থেকে আলোকিত করেন। বস্তুত এই দুই প্রান্তীয় আলোক সম্পাতের ফলেই তাঁর কবিতায় আলো-ছায়ার গভীরতার স্তরগুলি ভিন্ন তাৎপর্য পায়। আধুনিক কবি তাঁর অন্তবর্তী এবং বাস্তবতাকে তিনি একদিকে দেখে থাকেন বৃহত্তর বাস্তবতার অংশ হিসাবে। আর একদিকে দেখে থাকেন ক্ষুদ্রতর নানা বিপরীতের সমষ্টি হিসাবে। এই দুই আলোকের বর্ণমিশ্রণে চিরদিন কাব্য আধুনিকতার তাৎপর্য পায়। আমাদের উল্লেখিত দুই পর্বে রবীন্দ্রনাথের কবি-ব্যক্তিত্ব এই দুই আলোক ছটার যুগপৎ বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছে। কিন্তু অন্যত্র তিনি সম্মুখস্থ বাস্তবতাকে যতোটা বৃহত্তর বাস্তবতার অংশ হিসাবে বিবেচনা করেছেন ততোটা নানা ক্ষুদ্রতর অংশের সমষ্টি হিসাবে দেখেননি। রবীন্দ্রনাথ অরূপের কবি, আনন্দের কবি

প্রভৃতি জনশ্রুতিগুলি এই অযত্নের আগাছা। তার মানে এই নয় যে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অরূপ আনন্দ অথবা প্রশান্তি প্রভৃতি অভিধার কোনও ব্যক্তিগত তাৎপর্য নেই। আমাদের বলার কথা এই যে ব্যক্তিগত তাৎপর্যই আছে- এগুলিকে নির্বিশেষ তাৎপর্যে বিশ্বাস করার কোনও হেতু নেই। 'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক তবে তাই হোক'- এখানে মঙ্গল আলোক শেষ কথা বটে- আসল কথা দুঃখের তিমিরের যন্ত্রণা। নিজ জীবনের অন্তবর্তী এই তিমির-চেতনাই রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক কবির চরিত্র দিয়েছে। প্রত্যেক বড়ো কবি এই তিমির-চেতনার এবং আলোক চেতনার উপরে দাঁড়িয়ে জীবনের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতাকে ধারণ করেন। সেই পথেই তিনি অর্জন করেন মহাকবির অভিজ্ঞান।

তথাপি রবীন্দ্রনাথের সমস্যা আর তিরিশের আধুনিক কবির সমস্যা এক কথা নয়। প্রশান্তিকে আত্মস্থ করাই রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনের উদ্দেশ্য। তিরিশের আধুনিক কবির সমস্যা ছিলো ভিন্নতর। চতুর্দিকে আকীর্ণ অশান্তিগুলিকে অন্বিত করে তুলেই তিনি চেয়েছেন চিন্তার সমগ্রতা সৃজন করতে। ভাবের সমগ্রহতা ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুসন্ধেয়, চিন্তার সমগ্রতা হলো এ কালের কবিদের বিষয়। আধুনিক কবিদের ত্বরান্বিত জিজ্ঞাসা জটিলতা এই বিষয় ভাবনার বুনিয়াদ এবং মূল কাঠামো গড়ে তুলেছে। এই স্বতন্ত্র স্বক্ষেত্র গড়ে তুলতে গিয়ে আধুনিক কবিরা সচেষ্ট ভাবেই শ্যামল রবীন্দ্রনাথের দুর্নিবার আগ্রাসী আলিঙ্গনকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। এবং এক্ষেত্রে বাঙালি আধুনিক কবির ভূমিকা ছিলো ইংরেজ কবির থেকে অনেক বেশি দুরূহ। এলিয়ট প্রমুখকে যে কাব্য সংস্কার ভাঙতে হয়েছে তা ইংলন্ডীয় রোমান্টিক পুনরজ্জীবনের কবিদের স্মৃতির উত্তরাধিকার। এ উত্তরাধিকার যতো দুর্মরই হোক, কালের হাতে তার ক্ষয় শুরু হয়ে গিয়েছিলো নিঃসন্দেহে। আধুনিক বাঙালি কবিদের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তো শুধু স্মৃতি মাত্র ছিলেন না ছিলেন একটি উজ্জ্বল উপস্থিতিও। আধুনিক বাঙালি কবিদের সক্রিয়তা যখন শুরু হয়েছে তখনও রবীন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী হয়ে যাননি। এ কারণেই প্রতিঘাত জনিত আক্ষেপ বাংলা আধুনিক কাব্য সাহিত্যের প্রথম দিকে এতো তীব্র হয়ে উঠেছিলো। আধুনিক বাঙালি কবি প্রথম থেকেই এই কথাটা বুঝেছিলেন যে তাঁর সমস্যা কবি-সার্বভৌম হবার সমস্যা নয়। তাঁর সমস্যা প্রকৃতপক্ষে সাবালকত্ব অর্জনের সমস্যা। সে কারণেই এই কাজ তাঁদের কাছে কখনই একটা নেতিমূলক কাজ বলে প্রতিভাত হয়নি। এ ছিলো আসলে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানের নীলিমা থেকে বেরিয়ে মননের উষালোকে যাত্রা। অবশ্য অভিজ্ঞতার নিজস্ব বাণীরূপ রচনার এই পথে সমগ্র চৈতন্যের অভিব্যক্তি বাসনা কার ক্ষেত্রে কতোখানি কাজ করেছে সেই মূল্যায়নের নিরিখেই কবিদের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক সার্থকতা নির্ধারিত হবে। আমরা জানি সত্যেন্দ্রনাথের সূত্রপাত হলেও মোহিতলালে এবং যতীন্দ্রনাথেই এই কাব্যমুক্তি সাধনার পূর্ব ইতিহাস লিখিত হয়েছে। সেই তখনই, যতীন্দ্রনাথের কবি জীবন প্রত্যেক্ষের লবণাক্ত জল-হাওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে আকুল হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু আকুলতা একা একা বড়ো শিল্পের জননী হতে পারে না। যতীন্দ্রনাথও পারেননি। তবু তিনি তাঁর সতীর্থদের মধ্যে কথ্যভাষার শক্তিকে বুঝেছিলেন গভীরতার তাৎপর্যে। তাই তাঁর রবীন্দ্র-প্রতিরোধ কোনও কোনও কবিতায় তারকনাথের বঙ্কিম-প্রতিরোধকে স্মরণ করিয়ে দিলেও যতীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার দিক পরিবর্তনের ব্যাপারটিকে হৃদয় দিয়ে যতোটা বোঝা চলে ততোটা বুঝেছিলেন এ কথা মানতেই হবে। এইখানেই তাঁর গুরুত্ব।

আধুনিক কবির ক্ষেত্রে কবিদের নতুন অভিজ্ঞতার প্রশ্নটি ধীরে ধীরে গভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো। জীবনের প্রবীণতা সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হলে যে ভাব প্রতিভা বা প্রজ্ঞা বহির্মুখী চেতনারাশির উপর কাজ করে মহৎ কবিতার জন্ম দেবে তার জন্য অধ্যবসায়ী অন্বেষণও নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী ও বিষ্ণু দের চিন্তায় ও কবিত্বে সেই প্রশ্নের স্পষ্টতা আমরা তিনের দশকের শেষের দিকে লক্ষ্য করেছি। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় যে পাথুরে গৈরিক রঙে বর্ণবিভাস আমাদের কাছে নিয়তিকল্প কালকে মূর্ত করে তুলছে, তা নিঃসন্দেহে অনিবার্যভাবে রবীন্দ্র পোখিত বিশ্বাসের বিপরীত মন্ডলের বিষয়। বসন্ত ও বর্ষায় দুই বাহুতে জীবনের যে বৈভব রবীন্দ্রনাথ দেখেন, কালেরই তাড়নায় জীবনান্দ সেখান থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন- চলে আসেন হেমন্ত এবং কুয়াশার স্নান স্থিরতায়। সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে যে অস্থিরতা তা কোনও অর্থেই রবীন্দ্রনাথের গতি স্পন্দিত অস্থিরতা হতে পারলো না অভিজ্ঞতার পট পরিবর্তনের কারণে। আবার জীবনানন্দের ভিতরে প্রশান্তির আকাঙ্খা যদি থাকেই তবে তাও রবীন্দ্রনাথের শান্ততার সধর্মী নয়। উত্তর সামরিক মানুষের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের শুভাশুভের ধারণায় অংশভাগ হওয়া যে অসম্ভব এ কথা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সুধীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ ভেবেছেন। তাই এঁদের কাব্য সাধনার একটা বড়ো অংশে থেকে গেছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কোন স্তরে এবং কোন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে সে সমস্যার যন্ত্রণা। এ অনুমান অসংগত নয় যে সুধীন্দ্রনাথ এই সমস্যার পীড়নেই শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। জীবনানন্দ জেনেছিলেন যে এই পৃথিবীর রস রক্ত সফলতা সত্য তবু শেষ সত্য নয়। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে জীবনানন্দ খণ্ড সত্য ও পরম সত্যের চিরদ্বন্দ্বের যন্ত্রণা থেকে উত্তরণের দিশা পেয়েছিলেন বলেই হয়তো শেষ পর্যন্ত তিনি সচেষ্ট ছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর এই কথাটি খুবই ঠিক যে তিনের এবং চারের দশকের বাঙালি কবির প্রধান সমস্যা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এই সমস্যা রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে যাবার সমস্যা নয়। সমস্যাটা হলো রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করার সমস্যা। তাঁকে কোন কবি কোন সম্পদ বলে বিবেচনা করেন, সেটাই এক্ষেত্রে আসল কথা। অমিয় চক্রবর্তী অথবা বিষ্ণু দে কেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্বন্ধের প্রশ্নটি নিজ নিজ কবি জীবনের পরিণতির টানেই নতুন ভাবে ভেবে দেখত হয়েছে। বস্তুত কে কেমনভাবে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছেন, এও এঁদের বিচারের বেলায় একটি কষ্টি পাথর।

পক্ষান্তরে চারের দশকের তরুণতর কবিদের কাছে রবীন্দ্র- সম্পর্কের সমস্যাটি আর তেমন করে অনুভূত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বাংলা কবিতার পঁচিশ বছরের ইতিহাস আলোচনায় এ কথাটি দুঃখাত্মক সত্য যে তিরিশের কবিরা যেমন রবীন্দ্রনাথের মহৎ ঐতিহ্যের পটভূমিকেই নানাভাবে ব্যবহার করলেন, চারের বা পাঁচের দশকের কবিরা সেক্ষেত্রে আধুনিক কাব্যের পুরোধাদের পটভূমিকেই ব্যবহার করার সুযোগ লাভ করে কিছুটা আলস্য মন্থর হয়ে পড়লেন। তরুণতর কবিদের পক্ষে এটা কোনও দিক দিয়েই মঙ্গলের হয়নি। কিন্তু সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে ওই আমাদের জানা দরকার যে রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার নিজস্ব সমস্যাকে গ্রথিত করে প্রধান কবিরা কে কেমনভাবে কী ভেবেছেন।

আধুনিকতার সমস্যা তিনের দশকের কবিদের বিব্রত করেছে, আলোড়িত করেছে। ইতিপূর্বে এলিয়টিয় কাব্যের মাধ্যমে আবেগের নতুন অবয়ব যখন গড়ে উঠেছে আধুনিক বাঙালি কবিদের কেউ কেউ তখনই মুক্তির বিষয়টাকে সেই আলোকেই বিবেচনা করছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ্ণু দে কাব্যের সার্থকতা বিবেচনায় সেই তাৎপর্যকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' কাব্যে কবির দীপ্যমান ইমোশন কোনও ব্যক্তিগত নিভৃত ইমোশন নয়। নিজ অহম্ এর হাত থেকে মুক্তি নিয়ে কবি এখানে জাগতিক দৃষ্টিকে অধিগত করেছেন। নিঃসন্দেহে ইতিহাস চেতনা এক্ষেত্রে কবির বড়ো সহায়। এলিয়টের সুবিস্তৃত সংকট চেতনা যে কাব্যবৃত্ত সৃজন করলো তার ফলশ্রুতিতে প্রমোদ প্রদান লক্ষ্য ছিলো না, লক্ষ্য ছিলো না কাব্যের কুহক রচনা। এলিয়ট চেয়েছিলেন তাঁর সার্বিক আত্মসংবিতের গহন ভাষাকে মুক্তি দিতে। এই ভূমিকা পালন করার জন্যই কবিকে প্রস্তুত হতে হয়- প্রস্তুত হতে শিখতে হয়। নিজের ব্যক্তিগত ভালো লাগা মন্দ

লাগার আবেগময় আকর্ষণের হাত ছাড়াতে হয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিশেষ করে বিষ্ণু দে আধুনিক কবির এই খ্যাতির অর্জনের জন্য সবিশেষ মনোযোগী হয়েছিলেন। সেই অর্থে বিষ্ণু দে-র টয়াঠুংরী' যথার্থই এ কালের কবিতা এখানে কবির যিনি নায়ক, তিনি প্রাক- তিরিশের কবির জন্য সাজানো আসরের বাইরে চলে এসেছেন। সে নায়ক কথারীতিকেই নিজেকে মোচন করার মাধ্যম বলে মেনে নিয়েছেন বিনা আড়ম্বরে। সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র কবিতাতেই দেখা গেল যে তিরিশের বাঙালি মধ্যবিত্তের আত্মবিস্মৃতির আবরণকে ছিন্ন করতে চেয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙালি মধ্যবিত্তের চেহারাকে তাঁরা তন্নিষ্ঠতায় স্পষ্ট করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত সভ্যতার ক্রমবর্ধমান সংকটের চেতনাই এঁদের কবিতায় মৌল আবেগ ভূমি ছিল। এবং যে আবেগ ভূমিতে কোনও আগাছা জন্মাতে পারেনি এঁদেরই বুদ্ধি কর্ষিত পরিচর্যার ফলে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে আধুনিক বাংলা কাব্যের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হলো। এখান থেকেই দ্বিতীয় পর্যায়ে কালগণনা শুরু হচ্ছে বটে, কিন্তু এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু একান্তই বাইরের ঘটনা- প্রকৃত ঘটনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্রমবিস্তৃতি। প্রথম মহাযুদ্ধের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়াগুলি আমাদের দূরাগত তরঙ্গের মতো আঘাত করেছিলো। ২য় মহাযুদ্ধ একে বারে আমাদের হাত ধরে ডাক দিলো। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী প্রস্তুতি পর্বের প্রকৃত পরীক্ষা শুরু হলো এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আলোড়নের কালে। কাব্যে কথারীতির প্রতিষ্ঠা রোমান্টিক কাব্যিক নায়কোক্তির স্থলে নিরাসক্ত চিত্ত নায়কের আলাপনের আয়োজন, চিত্রকল্পকে ধীরে ধীরে প্রতীক পরিণত করায় সাধনা, এক কথায় প্রসঙ্গের ও প্রকরণের মোকাবিলা করতে করতেই নিজ নিজ কবি সত্তার প্রকৃত স্বাক্ষরকে আয়ত করা- এই সমস্তেরই আয়োজন শুরু হয়েছিলো দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্বে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাস্তব ঘটনার যে তীব্র আধিপত্য বিস্তার করলো তাকে ব্যবহার করতে গিয়েই আধুনিক বাংলা কবিতার আদি রীতির আত্মপ্রত্যয় লাভও ঘটলো। তখন দেশ বিদেশের ঘটনাবলির বিশিষ্ট চাপে বিশ্ব নামক ব্যাপারটা বাঙালি মধ্যবিত্ত পাঠক মন্ডলীর কাছে নিজে নিজেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছিলো। এই প্রত্যক্ষতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত কালের জটিলতা সম্বন্ধেও বাঙালি দ্রলোক আর আগের মতো উদাসীন থাকলেন না। তাঁর অস্তিত্বকে তিনি বিশ্বগত জটিলতার অংশ বলেই চিনে নিতে পারলেন। স্বভাবতই তাঁদের মধ্যে যাঁরা কাব্য-পাঠক, তাঁরা তথাকথিত আধুনিক কবিতার মধ্যে নিজেদের ভাঙাচোরা, আঁকাবাকা অথচ যুযুধান অস্তিত্বের ছায়া খুঁজে পেলেন। আধুনিক বাংলা কবিতার আদি রীতির আত্মপ্রতায় লাভের মূলে চারের দশকের এই অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ততোদিনে রবীন্দ্রনাথের আমি তুমি-কে স্থানচ্যুত করে বাঙালি কবিদের আমরা নতুন অর্থদ্যোতনা নিয়ে এসেছে। সে অর্থদ্যোতনায় এক প্রত্যয়ের গৌরব ক্রিয়াশালী ছিলো এবং এই প্রত্যয়ের গৌরব থেকেই চারের দশকের কাব্য চেতনায় জীবনের ব্যাপ্তি চেতনা এতো প্রাধান্য লাভ করেছে। অবশ্যই এই প্রাধান্য লাভ কাব্যিক সার্থকতার জন্য তৎপর হলে তবেই তাকে আমরা শিল্পের মর্যাদা দেবো। চারের দশকে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিদের কাছে এই সমস্যা কীভাবে প্রতিভাত হয়েছে তা এই কারণে বিশেষ করে বিচার্য।

কবিত্বের অনির্বচনীয় আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে পুরোধা আধুনিক কবিবৃন্দ প্রথমেই সেই জীবন্ত ভাষাকে সন্ধান করেছিলেন, যা একদিকে ব্যক্তিত্বরূপের স্বাক্ষরবহ, অপরদিকে গদ্য-পদ্যের অযথা প্রতিযোগিতাকে প্রশ্রয় দেয় না। কাব্যের স্রোতস্বিনীই তরঙ্গের উপযুক্ত লীলাভূমি। তাই কাব্যে তাঁরা কথারীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন আবেগের অসাধারণত্বকে অঙ্গীকার করেই। কবি অমিয় চক্রবর্তীর কাব্য সাধনা চারের এবং পাঁচের দশকে নিঃসন্দেহে এই দুই মেরুকে বাঁধবার চেষ্টা করেছে তাঁর ছন্দের বিচিত্র বন্ধনে। অমিয় চক্রবর্তী প্রশান্তির কবি। এই অর্থে তিনিই একমাত্র আধুনিক কবি রবি দীপ্তির শেষ রাগ যাঁর

জগৎ থেকে কোনওদিন মুছে যায়নি। বিষ্ণু দের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যের অন্তর্গত। সে শক্তিমান ঐতিহ্যকে তিনি মননের প্রতিবেশে লালন করে থাকেন। অমিয় চক্রবর্তীর কাছে রবীন্দ্র মানসিকতা প্রত্যক্ষ ব্যাপার। কোনওদিনই তিনি মৌল অর্থে un- Tagorean নন। গম্বুজ বা উঁচু বৃক্ষশ্রেণির ঋজুরেখা, বা কোনও শহরের আলোর বিন্দু অমিয়বাবুর কাব্যে প্রায়ই প্রসঙ্গ-ধৃত হয়। বৃক্ষ ইব স্তব্ধতার দিকেই তিনি অভিযাত্রী। অনির্বচনীয়কে তিনি খোঁজেন। এই গম্বুজ বা বৃক্ষ শ্রেণীর ঋজুরেখায় প্রতীকী ব্যঞ্জনা নেই- কিন্তু ধূলিধূসরিত জগতের ঊর্ধ্বশায়ী অনন্তের দিকে ইঙ্গিত করে এরা। অমিয়বাবুর প্রশান্তি একটি নৈসর্গিক হ্রদের সঙ্গে তুলনীয়। সীমান্তহীন সংসারের ছায়া পড়ে সেখানে। কখনও কখনও ঝড়ের মেঘও যে ছায়া ফেলে না তা নয়। কিন্তু তাতে নৈসর্গিক হ্রদের চরিত্র পাল্টায় না। আমরা যে এর তীরে গিয়ে দাঁড়াতে চাই তার কারণ এর অকৃত্রিমতা। চারের ও পাঁচের দশকের বাক্যসাধনায় ভাষার মুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় ভাষার মুক্তি ছন্দের মুক্তিকেও ত্বরান্বিত করেছে। এ প্রসঙ্গে ভাষার সংস্কার মুক্তির বিষয়ে অমিয়বাবুর কবি প্রকৃতির গতি ও প্রবণতাও লক্ষণীয়। অমিয় চক্রবতীর ভাষাও জীবনানন্দের মতো আবেগের নাটকীয়তা ধারণ করার ভাষ্য নয়। হাদা মৃদু ভাষণের পরিশীলিত পরিবেশই যে অধিকতর সাবলীলতা ভোগ করে থাকে। এখানে আবার জীবনানন্দের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যও বটে। জীবনানন্দ এক নিজস্ব দার্শনিক মনোভঙ্গিকে সহায় করে বহু অসমকে একত্র ঠাঁই দিতে পারেন। তাঁর ভাষাতেও সেই বিষম সমাবেশের নিবিড় নিশিন বিদ্যমান। অমিয়বাবুর পক্ষে তা সম্ভব নয়। অমিয়বাবু নাট্যিকতাকে অনুভবই করেন না। জীবনানন্দ হয়তো অনুভব করেন। কিন্তু তিনিও তাঁকে পরিবর্জন করতে পারলেই তাঁর স্থিরতার ধ্রুবপদে আশ্রয় পান সহজে। চারের ও পাঁচের দশকে জীবনানন্দর প্রধান পরিবর্তন এই যে কবি জীবনের প্রাথমিক স্তরে যে মৃত্যু চেতনা বারে বারে সব কামনার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে, তার হাত থেকে কবির কিছুটা মুক্তি ঘটেছে। জীবনানন্দের কবি জীবনের প্রাথমিক মৃত্যু বোধের পশ্চাৎবর্তী মানসিকতা আধুনিকতার বিষঙ্গকরণের যন্ত্রণাসঞ্জাত en-nui এর ফল। চারের ও পাঁচের দশকে দুর্ভিক্ষ যুদ্ধ ও সর্বব্যাপী মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে কবির স্বাভাবিক মানবিক জিজীবিষা প্রবলতা লাভ করেছে। মানুষের অমল' ভবিষ্যতের কথা অতঃপর জীবনানন্দের কাব্যালয়ে স্থান পেলো। ইয়েটসিয় প্রতীকী রহস্য, কীটসিয় স্বাদু ইন্দ্রিয় গ্রহিতা এবং কচ্চিৎ কখনও ডিলা মেয়ারিয় স্বপ্নাচ্ছন্নতায় বিভোর পথিক জীবনানন্দের নিজ আকুলতা- অমিয়বাবুর মতোই, দেশজ প্রশান্তির নীড়ের জন্য। এই তাঁকে ভিতর থেকে টানে। এই জীবনানন্দের প্রিয় কবি প্রসঙ্গ-গম্বুজ এবং সরলরেখ বৃক্ষ যেমন অমিয়বাবুর। দ্বিতীয় সমরোত্তর কালে নীড়ের প্রতীকে জীবনানন্দ নীড় ভাঙা মানুষের অনেক কথা বলতে পারতেন। কিন্তু জীবনানন্দ অতীতকে যে আবেগে ধরতে পারলেন, অতীত এবং ভবিষ্যতের বর্তমানকে সে তুলনায় উলব্ধি করেননি। এই অপূর্ণতা জীবনানন্দের কবি জীবনের পরম স্বার্থকতার প্রতিস্থক হয়েছে। জীবনানন্দের কবি ব্যক্তিত্বের এই অপূর্ণতাজনিত সংকট 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় বিশেষভাবে প্রতিফলিত।

আসলে জীবনানন্দও বুদ্ধদেবের মতোই রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাকে এড়িয়ে আধুনিক কবির সমস্যাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ আধুনিকতা বলতে বুঝেছিলেন বিশ্বকে ব্যাক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার ভাবে দেখা। এই দেখাকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কালের নিজস্ব দৃষ্টি সম্পদ বলে মানতে নারাজ ছিলেন। কিন্তু এই দেখাকেই তিনি বলেছেন উজ্জ্বল ও বিশুদ্ধ। নির্বিকার কথাটির তাৎপর্যে কবি আধুনিকতার গুরুত্ব নির্দেশ করেছেন। নির্বিকারত্ব অর্জনের জন্য অহমিকার একটি একটি আবরণ থেকে মনকে মুক্ত করে চলতে হয়। এবং যতক্ষণ না নিজ আত্মস্বরূপের, নিজ ব্যক্তিসত্তার নিরভিমান অকৃত্রিমতায়

গিয়ে পৌঁছানো যায়, ততক্ষণ এ চলার বিরাম নেই। অতঃপর কবি সেই ভাষাকে মূর্তি দেবার শক্তি আয়ত্ত করেন, কলিংউড যাকে বলেছেন সামাজিকের দুর্নিরীক্ষ গহন ভাষা। বুদ্ধদেব বসু আধুনিক কবিত্বের এই অভিজ্ঞানকে মানতেন না বলেই বিষ্ণু দেকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার বন্ধু সুধীন্দ্রবাবুর মারফত জানলুম যে আপনার মতো এলিয়টভক্ত কখনও নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নায় কাব্য লেখেন না। তবে কিসের তাড়নায় লেখেন?' নিছক' কথাটিকে অবজ্ঞা করার জনাই সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্যের নিহিতার্থ বুদ্ধদেববাবু হারিয়ে ফেলেছেন। অথচ বুদ্ধদেবও এলিয়টের দ্বারা সজ্ঞানে চিহ্নিত হয়েছেন। তাঁর কবিতায় ফাঁপা মানুষ ও পোড়ো জমির কথা তাঁর এলিয়ট অনুসৃতিরই ফল। এলিয়টের কাব্যানুকৃতির ফলে বুদ্ধদেব বসু হয়তো topical হয়েছেন, কিন্তু এই সব নয়, নিছক অন্তঃপ্রেরণা যে বেশি দূর নিয়ে যায় না, সজ্ঞান কাব্যপ্রয়াসের এক অনপসরণীয় ভূমিকা রয়েছে, তাঁর কাছ থেকেই সেটা বোঝা যায় 'দময়ন্তী কাব্যগ্রন্থের (প্রথম সংস্করণ) পরিশেষে সংযুক্ত আধুনিক কাব্য-প্রকরণের নির্দেশিকায়। বুদ্ধদেব আধুনিকতার ব্যাখ্যায় অন্যত্র বলেন যে, each generation has its own set of the moderns' and to claim for each a new and exclusive aesthetic quality is to deny continuity to history and unity to human nature'

জীবনানন্দও এই ব্যাখ্যাকে অনুসরণ করেন; বলেন, 'মানুষের মনের চির পদার্থ কবিতায় বা সাহিত্যে মহৎ লেখকদের হাতে যে বিশিষ্টতায় প্রকাশিত হয়ে ওঠে তাকেই আধুনিক সাহিত্য বা আধুনিক কবিতা বলা যেতে পারে।' এঁরা দু'জনেই আধুনিকতা অপেক্ষা চিরন্তনত্বের গভীর রহস্যকেই অধিকতর অনুধাবন করতে চান। এবং সেদিক থেকে জীবনানন্দ এবং বুদ্ধদেব প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথের উক্তিকেই গভীরার্থ প্রদান করেন, 'এ কোনও বিশেষ কালের নয়। কিন্তু নির্বিকার তদ্গতভাবে দেখার তাগিদ সকল যুগে সমছন্দ নয়। দ্বান্দ্বিকতার তীব্রতায় কোনও কোনও যুগে এই তাগিদ স্বভাবতই জোরালো হয়ে ওঠে। সেই যুগে সচেতন কবিই নিজ কালখণ্ডে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের আভাস রচনা করেন। এই কবিই আধুনিক কবি।

রচনা সূত্র -

১) রবীন্দ্র সমসাময়িক রচনা - ড: শৈবাল বসু।

২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ প্রবন্ধ - মনিময় দেববর্মা।

৩) ''সন্ধিক্ষণ'' সাহিত্য পত্রের কিছু আলোচনা।

# দুঃখ বলে রইনু চুপে

[ গল্প ]

মধুপর্ণা নাথ

কলকাতায় নামার পরই প্রথমে যা ঘটল তা হলো এয়ারপোর্টে আমার হাত থেকে পড়ে দামী ঘড়িটা ভেঙে যাওয়া। আর সেই ঘড়িটা ঠিক করানোর তাগিদেই কলেজ স্ট্রীটের বৃটিশ আমলের পুরোনো ঘড়ি-সারাইয়ের দোকানটাতে ঢুকলাম আর দেখতে পেলাম 'তাকে'; প্রায় ১১ বছর পর।

আজ ১১ই নভেম্বর ২০১১, ইউরোপীয় মতে ১১/১১/২০১১ অনেক শুভ সংখ্যা তাই আজ একটা সৌভাগ্যের দিন বলা যেতে পারে, কিন্তু নিজের প্রাক্তন প্রেমিকাকে নিজের পাশে দাঁড়ানো দেখতে পাওয়া কি ঠিক সৌভাগ্যের পর্যায়ে পড়ে? তা ঠিক জানি না।

আমি তার সাথে কথা বলতে যথেষ্ট ইতস্ততবোধ করছিলাম। এক ঝলকের জন্য চোখের কোণ দিয়ে সন্তর্পণে তার মুখাবয়বটা আলতো দেখেই আবার ভাঙা ঘড়ির দিকে নামিয়ে নিলাম চোখ। ঘড়ির দোকানে চারিদিকে ঘড়ি, সবদিকে চলছে ছুটন্ত সময় অথচ আমার মনে হলো সময়টা থেমে গেছে কিংবা শুধু থেমে থাকেনি ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছে পিছের দিকে ।

''মিস্টার আর্টিস্টের এখনও 'জর্জিও আরমানি' ঘড়ির প্রতি খুব টান রয়ে গেছে বুঝি !''

অ্যাডিলেডের সেই পরিচিত গলার স্বর কানে আসতেই আমি অস্বস্তি আর অপরাধবোধ দুটোই বোধ করলাম তবে তা লুকিয়ে রেখে মৃদু হেসে জবাব দিলাম 'হাই লিডি,'

তার পুরোনো সাদা কার্ডিগানের নিচের ফ্যাকাশে বেগুনি রঙের পোশাকটা দেখে মন্তব্য করলাম, ''বেগুনি এখনও তোমার প্রিয় রং, তাই না ?''

সে মাথা নেড়ে হাসলো, ''তোমাকে বাদ দিয়ে আমার বাকি সব প্রিয় জিনিসগুলো এখনও একই রকম আছে, আমি এত তাড়াতাড়ি বদলাই না।''

কথাটা সে মজার ছলে বলেছে , আমি তাকে ছেড়ে চলে গেছি এই অনুযোগটি সে আনে নি, আনবার মতো মানুষও সে নয়, তবুও নিজের আচরণের জন্য ভেতরে ভেতরে অপরাধবোধ আমায় কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল।

আমি তাকে ঠকিয়েছিলাম; অন্য কোনো মেয়ের জন্য নয়, বরং ভালো জীবনের খোঁজে, ভালো দেশের খোঁজে। আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম অ্যাডিলেডকে, পাড়ি জমিয়েছিলেন ফ্রান্সে কারণ আর্টিস্ট হবার স্বপ্ন পূরণ করবার ছিলো আর ঘরকুনো দায়িত্বশীল মেয়েটা এখানে থেকে গিয়েছিল নিজের বাবা-মা আর নিজের ব্যর্থ আইনজীবীর ক্যারিয়ার আঁকড়ে ধরে।

এখন ফ্রান্সে আমার একটা সফল আর্ট স্টুডিও আছে, একাধিক নারীসঙ্গভরা জীবনও আছে, একজন অবিবাহিত পুরুষের থাকার জন্য যথেষ্ট বড় বাড়ি আছে। সবই যেন পর্যাপ্ত ছিলো, কিন্তু আজ ১১ বছর পর যখন সেই মেয়েটাকে দেখলাম;যাকে খোঁজার চেষ্টা আমি গত এক দশকের বেশি সময় ধরে করি নি, আমার কাছে আমার এই পূর্ণ জীবনটা বড়ো ফাঁকা ফাঁকা লাগতে লাগল।

সে আমার পুরোনো দোষ নিয়ে কিছু বলেনি তাই আমিও নিজের অপরাধবোধটা খানিক পাশে সরিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলাম,

''অ্যাডিলেড! পাঁচ মিনিট হাঁটবে একসাথে ?''

''হ্যাঁ, চলো , আমিও তো হেঁটেই যাচ্ছি সামনে ,আমার মেয়ের কাছে।''

মেয়ের কথা উল্লেখ করতেই উত্তর পেয়ে গেলাম আমার মনের মূল প্রশ্নের - ''সে বিয়ে করেছে কি না ।'' হাঁটতে হাঁটতে জানতে চাইলাম,
''তোমার মেয়ের বয়স কত?''
'পাঁচ', সে বলল। হিসেব কষে দেখলাম , আমি চলে যাওয়ার কিছু বছরের মধ্যেই সে সংসার বেঁধে ফেলেছে এমনকি মাও হয়ে গেছে ।

থাক, আমি নিজেও তো আর খুব সাধুপুরুষ নই, কত সম্পর্ক ভেঙেছি গড়েছি এই বছরগুলোতে।

কিন্তু তবুও শত সম্পর্কের জঞ্জালের মাঝেও আমার মনে আমাদের সেই জীবনের প্রথমবেলার প্রেমের স্মৃতিগুলো অক্ষত ভাবে সজ্জিত আছে, ঠিক যেন বইয়ের তাকে সামলে রাখা প্রিয় বইটার মতো। বেশ বুঝতে পারলাম ভেতরের এক কোণে শুধুমাত্র তাকে সাথে রাখার অপূর্ণ তৃষ্ণা এখনো আছে ।

আমাদের কথা হচ্ছিল অল্প স্বল্প; সে বর্তমানের কথা তুলছিল, আর আমি বারবার তুলছিলাম আমাদের অতীত। দুজন মানুষের মধ্যে কিছু ভেঙে গেলে, যে নির্দোষ তার পক্ষে দোষীর ভুল কে ক্ষমা করা অনেক সহজ, কিন্তু দোষীর পক্ষে নিজের ভুলকে ভুলে গিয়ে নিজেকে ক্ষমা করা অনেক কঠিন। আসলে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা বিবেকদংশনের বিষাক্ত জ্বালা তো আর নিষ্পাপ হৃদয়কে ভোগ করতে হয় না!
''Sorry Liddy– for the past.''
কথার মাঝেই খাপছাড়া ভাবে বলে ফেললাম আমি, কারণ বুঝতে পারছিলাম তার হৃদয়ের গহীনে এখনো একটা অপ্রকাশিত যন্ত্রণা লুকিয়ে আছে।
''ঠিক আছে কবীর, সম্পর্ক ভাঙার জন্য সবসময় দুজনই দায়ী থাকে। হয়তো তুমিই বেশি দোষী ছিলে, কিন্তু দায় তো কিছু আমারও আছে ।'' সে বলল, তারপর রাস্তায় ছড়ানো ধূসর নুড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, ''তো এত বছর পর ভারতে আসার কারণ কী?''
''মা মারা গেছেন'', আমার কাঁপা কাঁপা কণ্ঠ থেকে কথাটা বেরোল। সে অবাক হলো শুনে এবং আমি জানি সে নিশ্চয় অনেক দুঃখও পেয়েছে কারণ আমার মা আর তার সম্পর্কটাতো বেশ আন্তরিক ছিল। মা-তো সবসময় চাইতেন যেন আমি অ্যাডিলেডকেই বিয়ে করি।
আসলে ধর্ম ও সংস্কৃতির ফারাক কিংবা হয়তো স্বয়ং ভাগ্যদেবতাও আমাদের আলাদা করতে পারতেন না, কিন্তু আলাদা হয়ে যাবার সিদ্ধান্তটা তো আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত ছিলো।
প্রায় সাত মিনিট হাঁটার পর সে বলল,
''এবার যেতে হবে, মেয়ে অপেক্ষা করছে।''
রাস্তার অপর পাশে একটা মিশনারী নার্সারি, ছোটো বাচ্চারা ছুটি শেষে দাঁড়িয়ে আছে - সম্ভবত সে সেখানেই যাবে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখলাম এখনো এয়ারপোর্ট থেকে কেনা কিছু চকলেট অযত্নে পড়ে আছে পকেটের তলদেশে
''এগুলো নিয়ে যাও । তোমার মিষ্টি মেয়েটার জন্য এই ইম্পোর্টেড চকলেট, এটা তো তোমারও প্রিয় ছিল একসময় !''
বলতে বলতে আমি তার ঠান্ডা হাতের তালু ঢেকে দিলাম খয়েরী রেফারে মোড়া এক গাদা চকলেট দিয়ে। সে কিছু বলল না, শুধু একটা নিষ্প্রাণ হাসি দিল।
''তোমার মেয়ের নাম কী?'' জিজ্ঞেস করলাম।
''লিনি ! আমি তাকে লিনি বলেই ডাকি। ভালো নামটা স্কুলের খাতায় পড়ে আছে, একটু সেকেলে নাম

হওয়ায় একটু বড় তাই ডাকা হয় না। আসলে তার Grandmother এর নামে রেখেছি ।"
"Granndmother মানে তোমার মা?"
"না, লিনির ঠাম্মার নামে, ওর বাবার মা।"

ধীরে ধীরে দেখলাম আডিলেড রাস্তা পার হয়ে গেল। আমি উল্টোদিকের ফুটপাথেই দাঁড়িয়ে রইলাম, জায়গাটা ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না অথবা দাঁড়িয়ে থেকে লিডর বর্তমান জীবন দেখার সাধ জাগছে। তাকিয়ে রইলাম সামনের রাস্তায় হেঁটে যাওয়া নারীটার দিকে।

কিন্তু আশ্চর্য লাগল যে সে নার্সারিতে ঢুকল না, বরং সে ঢুকে গেল মিশনারীর পাশে থাকা গির্জায় এবং কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি ধরলো, হয়তো রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকা আমাকে তার চোখে পড়ে নি।

আমি কোনকিছু না ভেবেই রাস্তা পার হলাম দাড়ালাম দ্বিতল সাদা গির্জার সামনে । ঢুকে দেখলাম প্রার্থনাস্থল পেরিয়ে গির্জার উঠোনের পিছন দিকেই রয়েছে একটা ছোট্ট কবরস্থান।

শান দেওয়া পাথরের ফলকগুলোর নীচে শায়িত অনেকগুলো কবরের মাঝেই চোখ গেলো জলপাইয়ের ছায়ার থাকা একটা ছোটো কবরের নিচে, কিছু সযত্নে রেখে যাওয়া সাদা গোলাপের সাথে আমার দেওয়া চকলেটগুলিও রাখা আছে সেই ছোট্ট কবরের ওপর। যেন কেউ আদর করে কবর টা পরিষ্কার করে জিনিসগুলো সাজিয়ে গেছে কবরটার উপর। এপিটাফের লেখা ডেট দেখে বুঝলাম, ওটা ছিল স্রেফ পাঁচ বছর বেঁচে থাকা এক বাচ্চার কবর;সে আবার মারা গেছে আজ থেকে আরোও পাঁচ বছর আগে। মৃত্যুর পর তো আর মানুষের বয়স বাড়ে না তাই মেয়েটা এখনো সেই পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়েটাই রয়ে গেছে , অথচ পাঁচ বছর ধরে সে এই শুয়ে আছে মাটির নীচের ঘরে , তার মানে দাঁড়ায় বাচ্চাটা জন্মেছিল প্রায় বছর দশেক আগে ! আমার বুকের ভেতরটা হঠাৎ ছ্যাঁত করে উঠল, রিনরিনে ব্যথা শুরু হলো বা পাশে, আমার পা দুটো এই বড় দেহ সামলাবার শক্তি পেলো না, আমি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম কবরটার কাছেই।

ফিসফিস করে নিজে নিজেই বললাম, "অ্যাডিলেইডের মেয়ে?" বুঝলাম, সন্তান মারা গেলেও মায়ের ভেতরের মাতৃত্ব বুঝি সারাজীবন বেঁচে থাকে।

লক্ষ্য করলাম পাথরে খোদাই করা ইংলিশ হরফে লেখা আছে বাচ্চাটার নামের প্রথম অংশ; 'মৃণালিনী'; যা আমার মায়ের নাম। সত্যিই তো, ছোট্টো সেই মেয়েটার ভালো নামটাতো ভালবেসে রাখা হয়েছিলো তার বাবার মায়ের নামে ।

## অঙ্গীকার

শিউলি শর্মা

এই অন্ধকারেও আলো জ্বেলে রেখেছে কিছু মানুষ,
যেমনটা  তারা রাখে চিরকাল।
যত্নে সেবায় বাঁচাতে চায় দুর্বল চারাটি,
এনে দেয় তারা উৎসাহের সকাল।

তাদের কথা খুব  কেউ জানে না বেশী
শরতে তারা কাশের মতো ফুটে,
হাওয়ার মাঝে গন্ধ যেমন মিলায় মোনালিসার হাসি যেমন ঠোঁটে।

তারা একদল কৈশোর ফুলদল এক ঝাঁক  গেলে আরেক ঝাঁক আসে
উৎসব সুখ স্বজন হারানো ব্যথায় যেমন তারা থাকে সবারপাশে।

আমরাও না হয় একটু পথ হাঁটি
সঙ্গে থাকি আরো কিছুক্ষণ
আকাশটাতে রামধনু আঁকি
আরো
মনের ভেতর জাগুক হাজারো মন।

## শারদ আনন্দ

সুপর্ণা ভট্টাচার্য

শরতের আকাশ নীলিমা ভরা
ঢাকের তালে বাজে আনন্দ ধারা।
বিলাসী হাওয়ায় কাশফুল দোলে,
শহর জাগে উৎসবের কোলাহলে।
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে ফেরে যে আপন
বাড়ির উঠোনে জাগে স্নেহ-স্পন্দন।
আলপনা আলোয় সাজে পথঘাট,
নতুন পেশাকে শিশু, মুখে উল্লাস।
ফুল, বাতি, আলোতে ভরা নগর
মিলনের সুখে কেটে যায় প্রহর।
শারদ উৎসব শুধু আনন্দের গান,
প্রেম-প্রীতি-আশীর্বাদে নতুনের আহ্বান।

## একা

নীলোৎপল গোস্বামী

বুকের গভীরে রাসলীলা নিয়ে
পাখির জন্য ঘুরে বেড়াত মেয়েটা।
সব পাখিদের গল্প একটাই
খাঁচার দরজা ভেঙে
গান গাইতে গাইতে
উড়ছে শুধুই
একা...

একবুক ভালোবাসা নিয়ে চেয়েছিল
একটুকরো খাঁচার মত ছোট্ট সংসার
গণ্ডী ভেঙে পাখিটা ছেড়েছে তাকে
এখন হাত পা ছাড়াই দৌড়োয় সে
একা...

ভালবাসায় জোড়া বগিগুলিকে ফেলে
বাঁধন ছিঁড়েছে ইঞ্জিন
চলছে; চলছে, চলছে
একা...

**বন্ধু** [ অনুগল্প ]

পারমিতা চৌধুরী

-আচ্ছা জড়তার প্রতিশব্দ কি?

জড়তা মানে, হেসিটেশন?

- হ্যাঁ, কিন্তু আমি বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজছি। আড়ষ্ট হয়ে থাকা, আড়ষ্টতা টাইনের?

- সাবাশ, থ্যাংকস রে।

ও নিজ মেনশন নট...

আচ্ছা জড়তার বিপরীত শব্দ কি?

- সেটাতো জানা নেই, ডিকশনারি তে দেখতে হবে।

স্কুলের পরে, রোজকার মতন পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরেছে দুজনে, একই পাড়ায় দুই মাথায় দুজনের বাড়ি, আর এক স্কুলে একই ক্লাসে পড়াশুনা। জ্ঞান হওয়ার সময় থেকে দুজনে হরিহর আত্মা। এতদিন হয় বাবা না হয় মা সাথে গেলেও, এবছর ক্লাস সিক্সে ওঠাতে দু বাড়ি থেকে অনুমতি এসেছে 'নিজেরা স্কুলে যাও, তবে সাবধানে, আর অবশ্যই একসাথে যাবে আসবে।' হেঁটে মিনিট দশেকের পথ, আর এই যাওয়া আসার কুড়ি মিনিট সারাদিনের সবচেয়ে প্রিয় সময় দু'বন্ধুর।

দুই বন্ধু মিলে সারাদিন কত কথা চলে, সব কথার কোনো প্রসঙ্গ ও থাকে না। আজ যেমন একজনের বাংলা পত্রিকা পড়তে পড়তে হটাৎ জড়তা শব্দটা চোখে পড়লো। দুজনেই ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্র, তবু নিজের ভাষার গল্প পত্রিকা না পড়লে কি ভালো লাগে?

এই তো সেদিন, শনিবারে, স্কুলের হাফ ডে। দুপুরের পরে তাই সেন্ট্রাল লাইব্রেরী গেলো দুজনে। একজন ক্ষুদিরাম আর আর আরেকজন বিনয় বাদল দিনেশের জীবনী নিয়ে বসলো। সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে, কে কি পড়েছে তার সারাংশ অপরজনকে বলতে বলতে এলো দুজন।

একসাথে সবকিছু নিয়ে আড্ডা, নতুন জিনিসের অনুধাবন করার মজাটাই আলাদা। সে পাড়ার মোড়ের ঝাল চানাচুর হোক, কিংবা স্যারের বাড়ির বকুনি, কোনটার স্বাদই যেনো বন্ধুকে ছাড়া পুরন হয় না। ভালো খবর কি খারাপ খবর, সবার আগে বন্ধুর সাথে ভাগাভাগি করা চাই।

আজকের বিকেলটা অন্যরকম, বাড়ি ফিরতে ফিরতে দুজনেই লক্ষ্য করলো, আজ বাতাসে কেমন একটা শীতলতা, সত্যি তো, বর্ষা পেরিয়ে শরৎ আসছে। হটাৎ একজনে বলে উঠলো, মাঠের ধারে যাবি? বাড়ি ফিরতে দেরি হলে মা বকবে জেনেও দুজনে আচমকা এমন একটা পরিকল্পনায় মজলো, 'চল যাই।' যেটা ভেবেছিলো ঠিক তাই, সারি সারি কাশে ভরে গেছে মাঠের দুই ধার। মাঠ পেরিয়ে ঝিল, ঐখানে আকাশটা বছরের এইসময়ে অস্বাভাবিক সুন্দর দেখায়। দুজনের প্রিয় জায়গা, পুজোর ছুটিতে যখন স্কুলে দেখা হয় না, এখানে এসে দুজনে সময় কাটায়। গরমে এখানে বসা কষ্ট, শীতে খোলা মাঠের কুয়াশা সাথে ঝিল থেকে ভেসে আসা হিমেল হাওয়া গায়ে বরফের ন্যায় ঠেকে। তাই এই জায়গার সর্বোচ্চ আকর্ষণের সময় এখনই।

নানা কথা বলতে বলতে আরো একটু এগিয়ে যায়, বর্ষার রেশ আছে এখনো, কয়েকটা জায়গা পিছল। হটাৎ পা পিছলে যাওয়ার উপক্রম হতেই একে ওপরের হাত ধরে সামলে নেয়, তবে এবার আর কেউ কাউকে থ্যাংকস বলে না। শুধু হাসে। ভাবটা এমন, এভাবেই সারাজীবন সকল ওঠা নামায় একসাথে থাকা

চাই। অনেকক্ষন দুজনে চুপচাপ সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে বাড়ি ফেরার পথে আবারও কথার খই ফুটে।

বলছি, মাকে বলিস না আবার কি? ওখানে যে গেছি, সেকথা? আচ্ছা ভাই তুই শুধু শুধু আন্টির কাছে কথা লুকোতে যাস কেনো বলতো? সেই তো দরে ধরা পড়ে যাবি, তবুও মিথ্যে বলবি...

আরে না, ওখানে যাওয়ার কথা তো বলবো, দেখ এত দেরিতে ঘরে গিয়ে যদি বলি অন্য কোথাও যাইনি, মা কি বিশ্বাস করবে? ঠিকই ধরে ফেলবে। তাছাড়া, পায়ে দেখ, কতগুলো চোরকাঁটা..

আরে ঠিকই তো, খেয়াল করিনি এতক্ষণ, ইস, জানিস বাবা কাল মাত্র আয়রন করিয়ে এনেছে প্যান্টটা, আমি মরেছি আজকে।

যাওয়ার আইডিয়াটা তোর ছিল

কিন্তু পড়ার উপক্রম তুই করেছিলি

- এটাই, এটাই মাকে বলিস না, আমি যে একটু হলে পরে ব্যথা পেতাম এটা মা জানলে আর রক্ষে নেই আমার।

- ওকে, ডান, কিন্তু এই, এই চোরকাঁটা গুলো কিভাবে ছাড়াই বল তো... ওমা কিরে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিস আবার।

- একটা কথা, বলবো?

- জিজ্ঞেস করার কি আছে, বল

- আমি না জড়তার একটা বিপরীত শব্দ খুঁজে পেয়েছি।

- ওমা তাই? কি রে?

- বন্ধু।

## জয় মা

দীপালোক ভট্টাচার্য

মা তুমি অশুভ শক্তি হরিণী
শুভ শক্তির আগমনী
আনন্দ-উল্লাসের পরিধি,
উত্তল-মুক্তির পথদিশারীনি।
অসুর বিনাশকারী জগৎরক্ষীণি।
মা তুমি উদার কণ্ঠে আর্তনাদের ফলপ্রসারিণী।
যুদ্ধ যাত্রার সুগম পথের আবহনী।
আকাশ-উত্তাল নীল তরঙ্গের প্রতিচ্ছবি-
মা তুমি জগৎধাত্রী,
বিনাশকারীণি, জগৎমাতা তরঙ্গীনি।
উদারকণ্ঠে মুক্তি দাতার ধরিত্রীনি।
নিঝুম দিগন্তে একান্ত প্রান্তে -
উদ্ধারকারীনি মা তুমি।
পাপ মুক্ত, হিংসা মুক্ত, দ্বন্দ্ব মুক্ত
ধরিত্রীণি মা তুমি।
দিগন্ত উন্মেচিত করে, আগন্তুকের পাশে
বিলাসিতার দম্ভ ভেঙে
উজাড় করা নব স্বপ্নের পথে -
ধরিত্রী রক্ষায় জটায় সেজে
সুগম সুন্দর প্রকৃতি বাঁচানো,
মা তুমি।

## ভাঙা দরজা

সাগর শর্মা

তোমাকে দেখার জন্য
যতবার বাইরে তাকাই
একটি ভাঙা দরজা
ভেজা পোষাকের মতো
মাঝখানে ঝুলে থাকে !

## কে হবে?

শিবানী পাল

আঁধার রাতের গগনে আমার
তুমি  কি ধ্রুবতারা হবে?
পুষ্পশূন্য মন বাগানে
সুগন্ধিত গোলাপ হবে?
ধূসর উষর হৃদ্ মরুতে
জল সিঞ্চনের মালি হবে?
কপোল বেয়ে ঝরে পড়া
কষ্টের বারি বিন্দু হবে?
মুক্ত বিহঙ্গের মতো পাখা মেলে
উড়তে আমার সহায় হবে?
কন্টক পথে এগিয়ে চলতে
আমার প্রাণের দোসর হবে?
বল হে সখা, বল হে নাথ
তুমি আমার কে হবে?

## পাহাড় ডাকে আমায়

[ ভ্রমণ কাহিনী ]

দীনবন্ধু সেন

২০২৪ ডিসেম্বরের শেষ শনিবার, ভোর ৪:৩০। হটাৎ ঘুম ভাঙলো। কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই উঠে রাইডিং ব্যাগে টুকটাক জিনিস ঢুকিয়ে নিলাম। রাইডিং জ্যাকেটটা জাস্ট আলমিরা থেকে বের করবো, পাশের রুম থেকে মা এর গলা। ধীরে ধীরে উঠে আসলেন আমার রুমে। কোথায় যাবো জিজ্ঞেস করতে আমি সত্যিই কোনো গন্তব্যের কথা বলতে পারিনি। ভোর ৫:১৫ মিনিটে আমি রাইডিং গিয়ার পড়ে ঠাকুরের উদ্যেশ্যে প্রণাম করতেই মা এসে বাম হাতের কনিষ্ঠাতে কামড় দিয়ে আশীর্বাদ করে দিলেন। এই রীতি অবশ্য আমার প্রত্যেক ট্রিপে যাওয়ার আগেই হয়ে থাকে। ভোর ৫:৩০ মিনিটে কনকনে ঠান্ডায় আমি ধর্মনগর কালীমন্দিরে প্রণাম করে উঠে পড়লাম আমার টি আর জিরো ফাইভ ডি ফাইভ ফাইভ নাইন এইটে, এক গন্তব্যহীন ট্রিপের উদ্যেশ্যে। ৬:৩০/৭:০০ টায় আমি চেরাগী ধাবায় চা এর কাপে ঠোট মেলাতেই মনে হলো কাছাকাছি হাফলং থেকে ঘুরে আসা যায় এই উইক এন্ড, মান্থ এন্ড আর ইয়ার এন্ডে। এবার বাইকের ট্যাংক ফুল করে একটানে আমি শিলচর। ১০/১০:৩০ টায় হালকা টিফিন করে তারাপুর থেকে বাম দিকের রাস্তা ধরলাম।

তারাপুর থেকে দুধপাতিল হয় ডলু। গ্রামীণ রাস্তা। তবে ভালো সরু রাস্তা। দুধপতিল পেরিয়ে ডলু চা বাগানের ভিতরে প্রবেশ করতেই রাইডের ফিল আসছে অন্য রকম। ভরা ঠাণ্ডার দিনে দুপুরের গা গরম করা রোদে আমি বাগানের মাঝবরাবর ছুটছি একা। ছাত্রবেলার খুব কাছের বন্ধু রত্নজ্যোতি একবার আমায় বলেছিল ওর খুব শখ ছিল একটা চা বাগানের মাঝে অবস্থিত কোনো পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার হওয়া। শহরের কোলাহল থেকে দুরে, রাজনীতির খেলার বাইরে থাকার ইচ্ছা আমারও। ইয়ার ফোনে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে শুনতে মনে মনে ভাবছি রত্নজ্যোতি পোস্টমাস্টার হতে পারেনি কিন্তু আমি হয়েছি। আমি পোস্টমাস্টার হয়েছি কিন্তু চা বাগানের ভিতরের কোনো পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার নই। যাইহোক, জীবনে সবকিছু নিজের চাওয়া, নিজের ইচ্ছে মতো হয় না। ভগবানের পরিকল্পনা থাকে অন্যরকম। জানি আসামের চা বিশ্বের অন্যতম চা এর মধ্যে একটি। আর আমি সেই চা বাগানের ভিতরের রাস্তা বরাবর চলছি আপন মনে।

ঘণ্টাখানেকের বাগান পাড়ির পর এবার শিলচর গুয়াহাটি মহাসড়কে। ওয়াও। কি রাস্তা। বাইকের গতি ৮০/৯০ কিমি প্রতি ঘন্টা না রাখলে হয়তো পিছন থেকে অন্য কেউ ধাক্কা দিতো। ডান থেকে বাম আর বাম থেকে ডানে বার বার টার্নিং কাটিয়ে কাটিয়ে চলছি হেলে দুলে। ক্লাস ইলিভেনে যদি নিহারেন্দু স্যার আমাদের না শিখাতেন যে বাইক চলন্ত অবস্থায় সর্বোচ্চ ৪৫° কোণে হেলোনো যায় নইলে দুর্ঘটনা ঘটবেই তাহলে আমি এই রাস্তায় চেষ্টা করতাম এই কোণের মান আরও বড় করার। টায়ারের খাঁজ, রাস্তার ব্যাংকিং আর ৪৫° কোণের ক্লাস আজ মনে হচ্ছে বারবার। আর পাড়ি দিয়ে চলছি দানব আকারের পাহাড়গুলিকে। আসামের একমাত্র হিলি স্টেশন হাফলং থেকে ট্রেন গুলি নামছে পাহাড়ের গা বেয়ে, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আর আমি উঠছি উপরের দিকে। কখনো ডান পাশে তো কখনো বাম পাশে পাহাড়ি নদীগুলিতে চলছে বিশালাকারের পাথরের খেলা। শত শত ঝর্ণার জলের অজস্র আঘাতগুলি মাথা পেতে নিচ্ছে পাথরগুলি। সবুজ পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে যাওয়া নদীতে কালো পাথরের উপর সাদা জলের বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ আর ঝর্ণার শব্দে যখন সবকিছু একাকার করে দিচ্ছে ঠিক তখনই কোনো দিক থেকে শুনতে পাবে ট্রেনের হর্ণের আওয়াজ। এককথায় সবকিছুর মিলনে সৃষ্টি হওয়া এই অনুভূতি শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট জায়গায় গিয়েই অনুভব করা সম্ভব।

আমি পাহাড়ের নীরবতা অনুভব করতে পারি। আমি পাহাড়ি নদীর যৌবন লক্ষ্য করতে পারি। আর আমি এই সবকিছুর স্বাদ পাওয়ার জন্যই পাহাড়ে যাই। পাহাড় ডাকে আমায়। কখনো সাড়া দেই কখনো জীবন্ত লাশ হয়ে পড়ে থাকি ঘরের কোণে, আটকে থাকি সম্পর্কের মায়াজালে, আর কর্মব্যস্ততার অজুহাতে। না কোনো কোনো ডাকে সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। নেশাখোরদের নেশা ও আমার থেকে কম। মানুষ মারা যায় নেশার জন্য আর আমি বেঁচে আছি নেশা করেই। যে একবার এই নেশায় ডুবে গিয়েছে সে আর ফিরে আসতে পারে না এই নেশা থেকে। আমি ও সেই ভ্রমণ নেশায় ডুবে আছি। সময় পেলেই বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়ার এই নেশা আমাকে বার বার ঘর থেকে টেনে বের করিয়েছে। নদী পাহাড় আর মহাসড়কের সৌন্দর্য্যকে মহিমান্বিত করেছে ব্রডগেজের উপর দিয়ে চলে আসা ট্রেনের ঝিকঝাক, ঝিকঝাক,ঝিকঝাক শব্দ। এবার পড়ন্ত বেলায় আমি হারাঙ্গাজাও বাজারে। ধীরে ধীরে খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত করার তাগিদ ধাওয়া করছে আমায়। পরিকল্পনাহীন ট্রিপ, তাই হোটেল বুকিং নেই আগে থেকে। বিকেল ৪ টায় আমি ঝাটিঙ্গা, ঝাটিঙ্গা আবার বিখ্যাত পরিযায়ী পাখির আত্মঘাতী হওয়ার জন্য। বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে পাখিরা এখানে এসে নিজেকে শেষ করে দিয়ে যায়। এবার আমিও ঝাটিঙ্গা বার্ড সুইসাইড পয়েন্টে। তবে নিজেকে শেষ করতে নয়। এসেছি একটি বছরকে শেষ করতে, নিজের একঘেয়েমি দুর করতে আর একাকীত্ব শেষ করতে।

এখান থেকে হাফলং শহর আর মাত্র ৭/৮ কিমি। পাহাড়ের উপর থেকে সূর্যাস্ত দর্শন কি অপরূপ লাগে যারা এখনো দেখেনি তারা অনুভব করতে পারবে না। সন্ধ্যা ৫ টায় আমি ডিমা হাসাও জেলার সদর দপ্তর হাফলং শহরে । ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ক্রিসমাসের ছুটি কাটাতে অনেকেই পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়ার সব হোটেল বুকড। এমন কোনো হোটেল বাকি রাখিনি যাদের দুয়ারে আমি যাইনি। নাহ্ পাইনি। কোনো হোটেলে রুম পাইনি। অবশেষে রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়েও যোগাযোগ করলাম। এখানেও থাকার সুবন্দোবস্ত নেই। সারাদিনের আনন্দ এবার মাটি হতে চলছে। অপরিকল্পিত ট্রিপের দুর্দশা গ্রাস করছে ধীরে ধীরে।

সব আশা শেষ হবার পর আমি এবার উপস্থিত হই হাফলং মূখ্য ডাকঘরে। ত্রিপুরায় আমিও একজন পোস্টমাস্টার। অফিসে ঢুকে নিজের পরিচয় দিলাম পোস্টমাস্টারকে। অত্যন্ত সহৃদয়বান ব্যক্তিত্বের অধিকারী পোস্টমাস্টার শ্রীযুক্ত দিলীপ বড়ুয়া। পরিচয় পর্ব শেষ হতেই আমাকে আশ্বাস দিলেন পোস্ট অফিসের মানুষ যখন হ্যাফলং এ রাত কাটাতে অসুবিধা হবে না। এবার আমার রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা হলো পোস্ট মাস্টার এর ঘরেই। অফিস শেষ হলো। রুমে গেলাম। ফ্রেশ হলাম। শহর ঘুরতে বেরিয়ে পড়লাম। রাতের শহরে পর্যটকদের আকৃষ্ট করছে শহরের মাঝখানের সেই হাফলং লেক। লেকের চারিপাশের লাইটিং আর ঝুলন্ত ব্রিজ সঙ্গে আপনজনদের নিয়ে আড্ডা দেওয়ার যে ব্যবস্থা রয়েছে ইচ্ছে করলে কেউ সারা রাত কাটাতে পারে এই লেকের পাশেই। এছাড়াও শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে রামকৃষ্ণ মিশন, লক্ষী নারায়ণ মন্দির, জগন্নাথ বাড়ি আর চার্চ। শহরের মাঝখানেই স্বগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে দনবস্কো স্কুলসহ অসম্ভব সুন্দর সেই চার্চ। পর্যটকদের টেনে ভিড় ধরিয়ে রাখছে এই চার্চ।

রাতের খাওয়া দাওয়া করে একটু তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়লাম। উদ্দ্যেশ্য পরেরদিন ভোর বেলা সূর্যোদয় দেখবো। ভোর বেলা ঘুম ভাঙলো , ধীরে ধীরে পোস্টমাস্টার মহাশয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ভোর ৫:৩০ এর আগেই আমি ভিউ পয়েন্টে উপস্থিত। সৌভাগ্যবশত আরও কয়েকজন সেনাবাহিনীর জওয়ানকেও পেয়ে গেলাম এখানে। ওরাও ঘুরতে এসেছে। আই লাভ ডিমাহাসাও এর

সামনে দাড়িয়ে আমি যখন একটি ফটো উঠার জন্য ওদেরকে অনুরোধ করছি সূর্যমামা তখন পিছন থেকে পাহাড় টপকিয়ে উকি মারছেন। সত্যিই এই পয়েন্ট থেকে সূর্যাস্ত, সূর্যোদয় দর্শন করা দুর্দান্ত। আজকের দিনে দাড়িয়ে এর কিছু স্থিরচিত্র না রাখলে এই ট্রিপটাই বৃথা। বন্দী করলাম এমন কিছু মুহূর্ত। ঘন্টাখানেক এখানে খাটানোর পর এবার শুরু হলো নতুন কোনো জায়গার উদ্যেশ্যে রওয়ানা। এবার মহাসড়ক দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে উপস্থিত হলাম মাইবং। ওয়াও। পাথর আর পাথর। পাথরের সাম্রাজ্য। কাছারি রাজত্বের ধ্বংসাবশেষ আর পাথরের রাজত্ব। প্রকৃতি নিজ হাতে সাজিয়েছেন মাইবং, মাহুর এই জায়গাগুলিকে। একা একা ঘুরছি আর ভাবছি এগুলোকে নিয়ে মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাস নেই কেনো? কি নেই এর মধ্যে। হাফলং স্টেশনকে পূর্ব ভারতের সুইজারল্যান্ড বলা হয়। কিন্তু মাহুর, মাইবং এগুলোকে মানুষ সামনেই আনছে না। ধীরে ধীরে চলছি অজানা অচেনা রাস্তায়। দিদাওকা, লামডিং হয়ে আমি এবার লঙ্কাতে। তবে শ্রীলঙ্কা নয়। আসামের লঙ্কা, এক ঝালহীন লঙ্কা। যেখানে রাবন নেই কিন্তু রামের ভক্ত প্রচুর। লঙ্কা থেকে ১৫ কিমি দূরে পানিমুর জলপ্রপাত। কপিলি নদী এই অঞ্চলে জলপ্রপাতে পরিণত হয়েছে। পানিমুর জলপ্রপাত নর্থ ইস্ট এর নায়াগ্রা ফলস। এখানে গিয়ে আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছি এই নদীতে এগুলো জল দেখছি না কেরোসিন। জল আর কেরোসিনের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন এই জলপ্রপাতে গেলে। বছরের শেষ রবিবার, প্রায় তিন/ চার হাজার মানুষের ভিড়, পিকনিক পার্টি মুটামুটি দুশো এর উপর। অগণিত মানুষের আনন্দে আমি একা। একা একা ঘুরছি ফিরছি সুযোগ পেলে কাউকে একটা ফটো তোলার জন্য আবদার করছি। এইভাবে এক পিকনিক পার্টির কয়েকজনের সাথে পরিচয় হয় গেলো। দুপুরের খাওয়া দাওয়া তাদের সাথেই সারলাম । এবার বেরোবার পালা। গুগল ম্যাপ মেরে দেখলাম উমরাংশু হয়ে হাফলং পৌঁছানোর শর্ট রাস্তা আছে। পানিমুর থেকে ৩০ কিমি দূরে উমরাংশু। উমরাংশুর গলফ ফিল্ড আর কপিলী নদীর উপর বাঁধ দিয়ে যে কৃত্রিম লেক তৈরি করা হয়েছে তা ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে টানবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উমরাংশুতেই সন্ধ্যা হয় হয় ভাব। আমি গুগল ম্যাপ অন করে রাতের অন্ধকারে ভাঙ্গা রাস্তায় বাইকের ক্লাস টানছি, এক্সেলেটর বাড়াচ্ছি আর ব্রেক কষছি। নির্জন পথ, একা আমি। মেঘালয়ের গা ঘেঁষে সরু পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে পৌঁছে গেছি আবার হাফলং শহরে। রাত তখন ৯:০০ টা। হাফলং এর বিখ্যাত মোমো খেলাম মন ভরে। নতুন নতুন ফাস্ট ফুডের আইটেম টেস্ট করলাম অনেক কিছু। কিন্তু আজ আর পোস্টমাস্টারকে ডিস্টার্ব করা যাবে না। থাকার ব্যবস্থা নেই। রাত ৯:৩০ তে রওয়ানা দিলাম বাড়ীর উদ্দেশ্যে। রাতের অন্ধকারে কখন কোন জায়গা ক্রস করলাম বুঝতেই পারলাম না। ঘন কুয়াশায় বাইক চালাতে অনেক কষ্ট হচ্ছে। শিলচরের আসে পাশে কোথাও এসে গেছি বুঝতে পারলাম। রাতের কর্তব্যরত পুলিশ কেউ কেউ ঠাণ্ডার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে আগুনে হাত শেকে দিচ্ছেন। আমি ও যোগ দেই তাদের সাথে। কিছুক্ষন কথাবার্তা আলাপচারিতার পর ঘুমন্ত শিলচর শহরের উপর দিয়ে চলে এলাম বদরপুর। রাত ২ টায় স্টেশনের পাশের স্টল থেকে চা খেয়ে নিজেকে গরম করলাম। ঘুমকে দুর করলাম, তৈরি করলাম নিজেকে বাকি পথের জন্য। দুইদিনের লাগাতার চাপে বাইকের চেন কিছুটা ঢিলে হয়েছে বুঝতে পেরেও এক টানে যখন ধর্মনগর পৌঁছাই তখন ঘড়িতে ঠিক ৪:০০ টা। এভাবেই শেষ হলো ২০২৪, শেষ হলো এক পাহাড়ের ডাকে সাড়া দেওয়া, শেষ হলো এক রোমাঞ্চকর ট্রিপ। সোমবার অফিসে ফিরলেও বার বার মনে হলো পাহাড় ডাকে আমায়।।

# সাহিত্যের উপজীব্য পলাশ ও তার ভেষজ ব্যাপ্তি

অভিজিৎ ভট্টাচার্য

'পলাশ' এই নামেই তার পরিচিতি। বর্ষা তাকে সজীব করে। তবে রূপ দেয় বসন্ত। বছরভর অব্যক্ত পথের দু'পাশে, কখনও আবার জঙ্গলে শাল-পিয়ালের মাঝে ধুলো মাখা শরীরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে . থাকে গাছগুলি, কিন্ত বদলে যায় বসন্তের ছোঁয়ায়। শাখা-প্রশাখা উপচে জেগে ওঠে উজ্জ্বল লাল-কমলার রঙিন ফুলের বাহারে, কোথাও বা হলদে। সেই রূপেই মোহিত হয়ে কবিতা, গান কত কিছুই না লিখে গেছেন বাংলার কবিরা। পলাশের সেই 'রাঙা হাসি' তো আর বছরভর মেলেনা। প্রকৃতির 'আগুন' রূপের সাক্ষী হওয়ার এই তো উওম সময়। আজ বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।

বাংলা সাহিত্য ও পলাশ---

'পলাশ আনন্দমূর্তি জীবনের ফাল্গুন দিনের,  
আজ এই সম্মানহীনের  
দরিদ্র বেলায় দিলে দেখা  
যেথা আমি সাথীহীন একা  
উৎসবের প্রাঙ্গণ-বাহিরে  
শস্যহীন মরুময় তীরে।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনবোধের অনেক কবিতায় এই পলাশের সুর বেধেছেন। 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের অংশ এই কবিতাটি, অদ্ভুতভাবে পলাশের অনেক ভেষজগুন ও আছে, জানিনা রবিঠাকুর কিতা জেনেই কাব্যগ্রন্থের নাম আরোগ্য রেখেছিলেন, না তা কাকতালীয়! শীতের শূন্যতার পর ফাগুনে পলাশ ও শিমুলের অগ্নিশিখা জ্বলে পথে প্রান্তরে। পাপড়ি মেলে হেসে ওঠে বাসন্তী ফুলেরা। যেন শীতঘুমের পর জেগে ওঠার গান ধরে প্রকৃতি। বসন্তের আগমনী বার্তা ছড়ায় পলাশ, শিমুল ও অশোকের অচিন্তনীয়রূপ।

যা প্রকৃতিকে লীলায়িত করে। পাতাঝরা গাছের শাখায় প্রকৃতি তার আপন লীলা. মত্ত হযে যেন লাল আবির ছড়ায়, আদর ও ভালবাসায় ।ফুলেভরা বসন্তে চলে নানা ফুলের দখলদারিত্বের লড়াই, এই ফাগুনে রবীন্দ্রনাথ থেকে ধার করে বলতে হয়- 'গাঁয়ের মেঠোপথের ধারে অযত্নে অবহেলায় শিমুল পলাশের কোল জুড়ে হেসে উঠেছে রক্তিম ফুল,মনে হয় একি পলাশের বসন্ত নাকি বসন্তের পলাশ।'

শুধু রবিঠাকুর কেন, কবি নজরুল ও তাঁর গানে পলাশকে ঘিরে প্রেমের কথা বলেছেন- 'হলুদ গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল, এনেদে এনেদে, নইলে বাঁধবো না বাঁধবো না চুল।' এছাড়াও অজস্র বাংলা কবিতায় ছড়িয়ে আছে শিমূল-পলাশের বসন্ত বার্তা। দোলের আগেও পরে পলাশ ফুলে ছেঁয়ে যায় গ্রাম বাংলা। তাই হয়তো কবিদের প্রিয় বিষয়ে দোল ও পলাশ এক নতুন মাত্রা পেয়েছিল, আজও তার রেশ এইটুকুও কমেনি। এছাড়াও পলাশের আগমন শুভ বার্তা বহন করে সবার মনে, তাই শ্রীপঞ্চমী বা বসন্ত পঞ্চমীতে বিদ্যাদেবীর আবাহনেও পলাশের উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি। বাংলা সাহিত্যেও রবীন্দ্র কাব্যের বেশ কিছুটা অংশ জুড়ে আছে পলাশ ফুল ও দোলের গান। যেমন ওরে গৃহবাসীতে-

'রাঙা হাসি, রাশি রাশি  
অশোক পলাশে,  
রাঙা নেশা মেঘে

মেশা প্রভাত-আকাশে,
নবীন পাতায় লাগে
রাঙা হিল্লোল,
দ্বার খোল, দ্বার খোল।'
বা ফাগুন হাওয়ার গান-
'তোমার অশোকেকিংশুকে
অলক্ষ্য রঙ লাগল আমার অকারণের সুখে।
তোমার ঝাউয়ের দোলে..
মর্মরিয়া ওঠে আমার দুঃখরাতের গান,
তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান
ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান।'

তাই বাংলায় দোল ও পলাশ ফুল একে অপরের পরিপূরক।

**প্রজাতি পরিচিতি...**

পলাশ বৃক্ষ পর্যায় পড়ে, এটি পর্ণমোচি জাতীয়। গাছের গোড়ার দিকটা অমসৃন হলেও এর শাখা-প্রশাখা খুব মসৃণ। ফাল্গুন মাসে এর পাতা ঝরে যায়,তখনই ফুলের কুঁড়ি আছে। চৈত্রে যখন ফুল ফোটে তখন এর অগ্নিকান্তিরূপ প্রকৃতিকে উদ্বেলিত করে। প্রাক্ বর্ষায় গাছে নতুন পাতা গজায়। একটি মূল বৃন্তে তিনটি পাতা থাকে, এর গঠন অনেকটা যেন পারিভদ্রেব (Erythrina indica) পাতার বৃহৎ সংস্করণ। ভারতের প্রায় সর্বত্রই অল্পবিস্তর এই গাছ পাওয়া যায়। হিমালয়ের নিম্নাংশে প্রায় ৪০০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত এই গাছ দেখা যায়। ভারত ছাড়া, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া প্রভৃতিদেশেও এই গাছটি আছে। সমগ্র ভারতবর্ষে এই গণের তিনটি প্রজাতি বর্তমান।এর বৈজ্ঞানিক নাম Butea monosperma kuntze, ফ্যামিলি- Fabaceae/papilionaceae, হিন্দিতে একটি টেসু বা ধাক্ বলে,অন্য দিকে সংস্কৃতে এটি কিংশুক নামে পরিচিত। পলাশ ফুলের কুড়ি দেখতে অনেকটা বাঘ নখের মত। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে চারটি রংয়ের পলাশ ফুলের তথ্য আমরা পাই, বাস্তবে কিন্তু সাদা ও গাঢ় লাল রঙের পলাশ সাধারণত দেখা যায়না। শুধুমাত্র লালচে-কমলা ও হলুদ রঙের পলাশ ফুলের প্রাধান্যই ভারতবর্ষে বেশি। এই ফুলের গঠন অনেকটা বক ফুলের মত। এই ফুলের আধারটির (calyx) গায়ে হাত দিলে ভেলভেটের মত মনে হয় এবং দেখতেও অনেকটা সেরকমই। ফলগুলো আকারে ছোট, অনেকটা সিমের মত। এক থেকেদেড় ইঞ্চি লম্বা, অনবনত ও ডাঁটার সঙ্গে লেগে থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যেও পলাশ বহুল চর্চিত বিষয়--- কবির ভাষায়

অপেক্ষন্তেগুনাণ্ সর্বেমদনেতু ব্যতিক্রমঃ।
বসন্তস্যাপিতদ্বন্ধোঃ পলাশ কুসুমে যথা।।

অর্থাৎ এই জগতে গুণের আদর সবাই করে কিন্তু প্রেমের স্বভাবেই ব্যতিক্রম। সেগুণী নির্গুণ মানেনা, সবার প্রাণেসমান সঞ্চার তার, আর প্রেমের মিত্র বসন্তের স্বভাবও তেমনি। সেও যখন উদিত হয় তখন গন্ধহীন পলাশের রং ধরায়। পলাশ ফুলের বর্ণনা দিতে কবি লিখেছেন- মদনাঘাতে ব্যাকুলিত হ'য়ে প্রস্ফুটিত যৌবনে বক্ষের কমল যুগলে করস্পর্শ করার পর মধু আহরণের সমাপ্তি পর্বে বাঁকা চাঁদের মত যে রদ চিহ্ন রেখে যায়, মনে হয় সেটা যেন ঠিক পলাশ ফুলের ছাপ। মনুসংহিতার নির্দেশনায় যারা চলেন তাদের

উপনয়নে অর্থাৎ পৈতে হওয়ার সময় পলাশ পল্লবের সমিধের দ্বারা হোম বা যজ্ঞ করার বিধি আছে। তেমনি সন্তান জন্মের পর ষষ্ঠী পূজোর দিন ভূতাপসরনে পলাশ পল্লবের প্রয়োজন, সেই রীতি,যা আজও গ্রামাঞ্চলের দেখা যায়।

এ তো গেলো সংস্কারের দিক, এবার নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যায়ও নতুন সাহিত্য ধারার দেখা মেলে- পল মানে গতি, সেই গতির সঙ্গে সঙ্গেই যার বিয়োগ তাই পল + অশ্ , আবার বৈদিক ধারায়ও বলা হয়েছে না, না পল মানে গতি ঠিকই, তবে সেই গতিকে যে ভক্ষণ করে অর্থাৎ থামায় তাই পলাশ। যদিও অথর্ববেদে এর গুণগত সমীক্ষাকে ভেষজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছে বৈদিক কল্পের ১৭/৫২/৩২১ সূক্তে।

সমিধাগ্নিদুবস্যত ঘৃতৈর্বোধয়তা তিথিম্।
অস্মিন্ হব্যা পলাশ তেহুবেম ধও রয়িমস্মেসুবিরম্।।

মহীধর এর ভাষ্যেও আমরা পলাশের বন্দনা দেখতেপাই। তিনি লিখেছেন - ওহে পলাশ, চলমান তার সঙ্গে গমনকারী পত্র অথবা চলমানতাকে যে ভক্ষণ করে অর্থাৎ স্থিতিশীল করে তাই পলাশ। যজমান তোমার পরিচর্যা করেন অতিথি, অগ্নিও সমিধের জন্য ঘৃতের দ্বারা, অতিথিকে জাগরিত করে বলেন 'তোমার কাছে অতিথি বীরপুত্র এবং সেই পুত্ররূপী শোভন ধন তুমি স্থাপন করো'। বৈদিক ধর্মে পলাশ ফুল পূজার উপচার হিসেবেও ব্যবহৃত হয় যা পূর্বেই বলা হয়েছে।

**বৈদ্যক তথ্য...**

ভেষজ ঔষধ তৈরিতে এই গাছটির ছাল, পাতা, ফুল, বীজ ও গঁদের ব্যবহার আমরা চরকের সূত্রস্থানের তৃতীয় অধ্যায়েদেখতেপাই। বেদের সূক্তি অনুসারে দুগ্ধপিষ্ঠ পলাশ রস পানে বীর্যবান পুত্র লাভ হয়। চরক সংহিতায় কুষ্ঠ রোগ নিরাময়েও পলাশ বৃক্ষের ব্যবহার সুস্পষ্ট। সুশ্রুত সংহিতার চল্লিশ অধ্যায়ে একে বাতহর ও কৃমিনাশক হিসেবে বর্ননা করা হয়েছে। অন্যদিকে সপ্তম শতকের বাগ্-ভটে একে রক্তপিও নাশক হিসাবে দেখানো হয়েছে। এছাড়াও চরক সংহিতায় এই গাছটিকে অর্শরোগের প্রতিকারক রূপে বর্ননা করা হয়েছে। এই গাছের গঁদ বৈদিক তথ্যানুসারে অত্যন্ত ফলপ্রদ ঔষধ। অতিসার, রক্তপ্রদর ও শূলরোগেও এর ব্যবহারের তথ্য আমরা পাই।এই গাছের গঁদ অস্থির গর্ভকে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

চরক সংহিতার মতোএকাদশ শতাব্দীর গ্রন্থ চক্রদত্তেও একে অর্শরোগের প্রতিষেধক হিসেবে মান্যতা দিয়েছে। ভেষজ তথ্য- মনোস্পার্মা (লিম) কুন্টজ, যা পলাশ নামে পরিচিত, এতে বর্তমান উদ্ভিদ রাসায়নিক গুলোর অত্যন্ত ফলপ্রদ ঔষুধীগুন আছে। বিভিন্ন গবেষণা পএ থেকেজানা গেছে এই গাছের বিভিন্ন অংশের নির্যাসে অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টিফাঙ্গাল,অ্যান্টি-ডায়রিয়া, হাইপোগ্লাইসেমিক, হেপাটোপ্রোটেক্টিভ, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, অ্যান্টি-হেলমিন্টিক, অ্যান্টি-কনভালসিভ, অ্যান্টিস্ট্রেস,অ্যান্টি-ডায়াবেটিক, অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি জাতীয় উদ্ভিদ রাসায়নিক (phytochemicals বা secondary metabolites) বর্তমান। এটি গলগন্ড, স্পার্মাটোরিয়া এবং সাপের কামড়ের চিকিৎসায়ও ব্যবহৃত হয়। এতে উপস্থিত মুখ্য ফাইটোকেমিক্যাল গুলো হল-বুট্রিন, আইসোবুট্রিন, বুটিন, বিউটিন, প্যালাসিট্রিন, প্রটিওলাইটিক ও লাইপোলাইটিক এনজাইম। এছাড়াও ইয়োপসিন, গ্যালিক অ্যাসিড, স্টিগমাস্টেরল, মেডিকারপিন, কাজানিন, আইসো-ফরমোনোনেটিন, হেক্সানোয়িক অ্যাসিড ইত্যাদি।

**লোকায়তিক ব্যবহার...**

পলাশের পাতা ও বীজচূর্ণ কৃমিনাশক, রক্তপ্রদর, উদরশূল ও অর্শরোগের নিরাময়ে আজও গ্রামাঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া লাবণ্য রক্ষায় পলাশের কচিপাতার রস প্রসাধনী হিসেবে অতীতকাল থেকেই অত্যন্ত

জনপ্রিয়। পলাশের ছাল অর্শরোগের প্রতিষেধক, গাত্রদাহেও এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। পলাশ বীজের চূর্ণ লেবুরসের সাথে মিশিয়ে খোস-পাচড়ায় লাগালে দ্রুত উপকার পাওয়া যায়। গ্রামবাংলায় এই গাছের ছাল আদা রসের সাথে মিশিয়ে সর্পবিষের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের ফুলও মূত্রকারক, রজস্রাব বর্দ্ধক এবং অতিসারে ব্যবহৃত হয়।

সৌন্দর্যের অনাদৃত রূপ---

'দেখিতে পলাশ ফুল অতিমনোহর,
গন্ধ বিনে তারে সবে করে অনাদর।'

উল্লেখিত পংক্তিটির মধ্যে প্রকৃতির এক চমৎকার বৈপরীত্য ধরা পড়েছে। পলাশ ফুলের রঙ অত্যন্ত উজ্জ্বল ও মনোমুগ্ধকর। বসন্ত এলে গাছের ডালে ডালে লাল-কমলা রঙের আগুন জ্বলে ওঠে, যা প্রকৃতিকে অপূর্ব সৌন্দর্যে ভরিয়ে তোলে, কিন্তু এই ফুলের কোনোগন্ধ নেই। আর তাই সমাজ একে অন্য ফুলের মতো মূল্য দেয় না। এটি আমাদের সমাজের বাস্তবতাকেও প্রতিফলিত করে। অনেক সময় বাহ্যিক সৌন্দর্যমুগ্ধ করলেও কোন একটি গুণের অভাবে মানুষ কাছে সে অবহেলিত। একই ভাবে, সুগন্ধযুক্ত ফুল যেমন রজনীগন্ধা বা চামেলি অনেক মূল্যবান, কারণ তাদের সৌরভ মানুষ ও পরিবেশকে মোহিত করে। তবে প্রকৃত সৌন্দর্য কি শুধুই সুগন্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ? পলাশ ফুলের মতো অনেক কিছুই আছে, যা হয়তো কোনো নির্দিষ্ট দিক থেকে কিছুটা কম কিন্তু তবুও তার একটি নিজস্ব সুদৃশ্যতা ও ভেষজ মহিমা আছে। প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যকেই আমাদের উপলব্ধি করা উচিত। পলাশ তার রঙের মাধ্যমেই বসন্তকে স্বাগত জানায়, ঠিক তেমনই প্রতিটি জিনিসের নিজস্ব সৌন্দর্যেরও গুরুত্ব আছে, যা কেবল বাহ্যিক উপাদানে নির্ভর করেনা। অতএব, পলাশ ফুলের গন্ধ না থাকলেও তার শোভা ও ভেষজগুন অনস্বীকার্য। এটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, কেবল বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কোন কিছু মূল্যায়ন করা উচিত নয়, বরং তার অন্তর্নিহিত গুণাবলীকেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

পরিশেষে স্মৃতিমেদুর পলাশ আজও আমাদের স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করে। মনে পড়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও পলাশীর প্রান্তরের কথা। যেখানে ভারত সূর্য অস্তমিত হয়েছিল ব্রিটিশ শক্তির কাছে, সম্ভবত সেই পলাশীও ছিল পলাশ বন।

**তথ্যসূত্র-**


১) কে. নাদকার্নি, ইন্ডিয়ান ম্যাটেরিয়া মেডিকা, জনপ্রিয়প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ভলিউম ১;পৃষ্ঠা ২২৩।

২) ভারতের আয়ুর্বেদিক ফার্মাকোপিয়া, খণ্ড-১, সংস্করণ-১, আয়ুষ, দিল্লি, পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯।

৩) চিরঞ্জীব বনৌষধী, তৃতীয়খন্ড, শিবকালী ভট্টাচার্যী, আনন্দ পাবলিশার্সপ্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা ২২৬ - ২৩৩।

৪) জৈন, এ., বেন্নি, ডি. এন., ও অশ্বিনী, এস. এম. (২০২১). প্রমেহ (টাইপ-২ ডায়াবেটিস) রোগেপলাশ বীজের ভেষজ ও ক্লিনিকাল কার্যকারিতা। আয়ুষধারা, ৮(৫), ৩৪৫০,৩৪৫৬.

৫) পটেল, জি., দ্বিবেদী, এন., ও ত্রিপাঠি, আই. পি. (২০১১). পলাশ গাছের জৈবরসায়নিক গবেষণা। কারেন্ট রিসার্চজার্নাল অফ বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, ৩(২), ৯৩,৯৬.

৬) ধাকড়, জি. জি., গাঞ্জিওয়ালে, এস. ভি., নওঘারে, এস. এম., শ্রীরাও, এ. ভি., কোচার, এন. আই., ও চান্দেওয়ার, এ. ভি. (২০২৩). পলাশ গাছ ও এর ঔষধি ব্যবহার সম্পর্কিত একটি পর্যালোচনা। রিসার্চ জার্নাল অফ ফার্মাকোগনোসি অ্যান্ড ফাইটোকেমিস্ট্রি, ১৫(২), ৮৭, ৯৪.

# স্পিনট্রনিক্স: ভবিষ্যতের প্রযুক্তির নতুন দিগন্ত

পায়েল ভট্টাচার্য

চৌম্বকের গোপন খেলা: স্পিনট্রনিক্সের জাদু

ভাবুন তো, একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলেন মোবাইল ফোনটি সারারাত চার্জ না দিয়েও দিব্যি চলছে। কিংবা কম্পিউটারের সুইচ টিপতেই, চোখের পলকে ভেসে উঠল আপনার সব কাজ, যেন সে কখনো ঘুমিয়েই পড়েনি। কেমন স্বপ্নের মতো শোনাচ্ছে? এই স্বপ্নকে বাস্তবের পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে এক বিস্ময়কর বিজ্ঞান-স্পিনট্রনিক্স।

আমরা সবাই জানি, বিদ্যুৎ আমাদের জীবনকে বদলে দিয়েছে। আলো জ্বালানো থেকে শুরু করে স্মার্টফোন চালানো-সবকিছুতেই বিদ্যুতের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু বিদ্যুৎ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি ইলেকট্রনের প্রবাহ। ইলেকট্রনের আছে শুধু বৈদ্যুতিক চার্জ নয়, আরেকটি লুকোনো বৈশিষ্ট্য-স্পিন। সহজভাবে বললে, ইলেকট্রনের এই স্পিন হলো তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘূর্ণন, যেটি ছোট্ট একটি চৌম্বকের মতো আচরণ করে।

ঠিক এই স্পিনকেই কাজে লাগিয়েই গড়ে উঠেছে স্পিনট্রনিক্সের জগৎ। এখানে শুধু চার্জ নয়, ইলেকট্রনের স্পিনকেও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এর ফলে তথ্য সংরক্ষণ ও পরিবহন হয় আরও দ্রুত, শক্তি-সাশ্রয়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী।

ইলেকট্রনের স্পিন: ক্ষুদ্র এক ঘূর্ণন, যার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে পুরো মহাবিশ্বে!

প্রতিদিনের জীবনে স্পিনট্রনিক্সের গুরুত্ব

একদিনের কল্পনা নয়, বরং আমাদের প্রতিদিনের জীবনেই ঢুকে পড়ছে স্পিনট্রনিক্স।

মোবাইল ও কম্পিউটার

আমরা প্রতিদিন ফোন ব্যবহার করি-চার্জ দিই, ভিডিও দেখি, ছবি তুলি। এখনকার ব্যাটারিতে বিদ্যুৎ দ্রুত শেষ হয়ে যায়, আর মেমোরি ভরে গেলে ফোন ধীর হয়ে যায়।

স্পিনট্রনিক্স-ভিত্তিক ভর্টেক্স মেমোরি থাকলে-ফোন চার্জে দীর্ঘস্থায়ী হবে,

তথ্য মুহূর্তে পড়া-লেখা যাবে, আর ডেটা কখনো হারাবে না, এমনকি বিদ্যুৎ চলে গেলেও।

* ইন্টারনেট ও ডেটা সেন্টার

আমাদের ছবি, ভিডিও, নথি সব জমা থাকে 'ক্লাউড'-এ। এগুলো সংরক্ষণ করতে বিশাল সার্ভার চলে দিনরাত, আর তাতে অপচয় হয় প্রচুর স্কাইর্মিয়ন-ভিত্তিক রেসট্র্যাক মেমোরি ব্যবহার করলে-বিদ্যুৎ। একই চিপে হাজার গুণ বেশি ডেটা রাখা যাবে, বিদ্যুৎ খরচ কমবে, আর সার্ভার গরম হয়ে পরিবেশের ক্ষতি করবে না।

* চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য

চিকিৎসায় প্রতিদিন রোগ নির্ণয়, ওষুধ প্রয়োগে দরকার নির্ভুল তথ্যপ্রযুক্তি। স্পিনট্রনিক্স দিয়ে তৈরি সেন্সর এতটাই সংবেদনশীল যে রক্তে এক ফোঁটা ক্যান্সার কোষও শনাক্ত করা সম্ভব। ফলে ভবিষ্যতে হাসপাতালে রোগ ধরা পড়বে অনেক আগেই, আর বাঁচানো যাবে অগণিত প্রাণ।

* পরিবহন

স্বয়ংচালিত গাড়ি আর স্মার্ট ট্রাফিক সিস্টেমের জন্য দরকার দ্রুত ডেটা প্রসেসিং। ভর্টেক্স ও স্কাইর্মিয়নের

গতিশীল ঘূর্ণি ব্যবহার করলে-গাড়ি সেকেন্ডের ভগ্নাংশে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, দুর্ঘটনা কমে যাবে, জ্বালানির ব্যবহারও হ্রাস পাবে।

পরিবেশ ও শক্তি

পৃথিবীর অন্যতম বড় সমস্যা হলো বিদ্যুতের অপচয়। বর্তমান কম্পিউটারগুলো যে পরিমাণ তাপ উৎপাদন করে, তার কার্বন নিঃসরণ বিমান পরিবহনের থেকেও বেশি ! স্পিনট্রনিক্স প্রযুক্তি এই খরচ অর্ধেক করে দিতে পারে। অর্থাৎ, আমাদের প্রতিদিনের ফোন, টিভি, ল্যাপটপ থেকে শুরু করে ইন্টারনেট-সব মিলিয়ে পৃথিবী আরও পরিবেশবান্ধব হবে।

তাই বলা যায়, ভর্টেক্স আর ফাইর্মিয়নের মতো ক্ষুদ্র ঘূর্ণিগুলো কেবল পদার্থবিজ্ঞানের খেলনা নয়-এরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নীরব সহচর। মোবাইলের ব্যাটারি থেকে শুরু করে হাসপাতালের যন্ত্রপাতি, স্কুলের কম্পিউটার থেকে মহাকাশযান-সবখানেই তারা একদিন হয়ে উঠবে অপরিহার্য।

ঘূর্ণির মতো ভর্টেক্স

চুম্বকের ভেতরে কখনও কখনও ইলেকট্রনদের স্পিন এমনভাবে সাজে, যেন ছোট্ট এক ঘূর্ণি তৈরি হয়েছে-এটাই ম্যাগনেটিক ভর্টেক্স। ভর্টেক্সের কেন্দ্রে স্পিন উপরের দিকে বা নিচের দিকে থাকতে পারে, আর এভাবেই গড়ে ওঠে দুটি পৃথক অবস্থা। এক অবস্থাকে আমরা ধরতে পারি '১' আর অন্যটিকে '০'। ঠিক যেমন কম্পিউটারের ভাষা চলে এই দুই সংখ্যায়, তেমনভাবেই ভর্টেক্স হতে পারে ভবিষ্যতের তথ্য সংরক্ষণের সবচেয়ে ক্ষুদ্র ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। ঘূর্ণির মতো এই কাঠামো এতটাই ছোট যে ন্যানোমিটারের ভেতরে তা ধরা যায়, অথচ নিয়ন্ত্রণ করা তুলনামূলক সহজ। তাই আগামী দিনের স্মার্টফোন বা ল্যাপটপ হয়তো এমন ভর্টেক্স-কোর মেমোরি ব্যবহার করেই চলবে-দ্রুত, শক্তি সাশ্রয়ী আর টেকসই।

ক্ষুদ্র ঘূর্ণিবল: স্কাইর্মিয়ন

অন্যদিকে আছে আরেক বিস্ময়কর টেক্সচার-ম্যাগনেটিক স্কাইর্মিয়ন। কল্পনা করুন, এক ক্ষুদ্র বিন্দুর চারপাশে ঘূর্ণি পাকাচ্ছে অসংখ্য স্পিন, যেন ছোট্ট এক মহাজাগতিক ঘূর্ণিবল। এই স্কাইর্মিয়ন অত্যন্ত স্থিতিশীল, খুব সামান্য শক্তি খরচেই এদের সরানো যায়। এর ভেতরে একদিকে স্পিন থাকে বিপরীতমুখী, আর চারপাশে থাকে পাকানো চৌম্বকীয় ঘূর্ণন। তথ্য সংরক্ষণের জন্য একে ব্যবহার করা যায় অসাধারণভাবে যেখানে '১' বোঝায় একটি স্কাইর্মিয়নের উপস্থিতি আর '০' বোঝায় তার অনুপস্থিতি। এই কৌশলেই তৈরি হতে পারে ভবিষ্যতের রেসট্র্যাক মেমোরি, যেখানে তথ্য দৌড়ে বেড়াবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্কাইমিয়নের মতো।

ক. উপরের চিত্রে দেখানো হয়েছে চৌম্বকীয় ভর্টেক্স, যেখানে ঘূর্ণায়মান চৌম্বক ক্ষেত্রের কেন্দ্র পোলারিটি পরিবর্তনের মাধ্যমে ০ ও ১ হিসেবে ডেটা লেখা যায়। এভাবে ছোট আকৃতির চুম্বকে উচ্চ ঘনত্বে তথ্য সংরক্ষণ সম্ভব হচ্ছে। খ. চৌম্বকীয় স্কাইরমিয়ন এবং স্কাইরমিয়ন ভিত্তিক ডেটা রেকর্ডিং। নিচের ছবিতে স্কাইরমিয়নের সাহায্যে বাইনারি ডেটা (০ ও ১) উচ্চ গতিতে এবং ঘনত্বে রেকর্ডিংয়ের প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে।

আমাদের জীবনে প্রভাব

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এসব কেন জরুরি ? উত্তর হলো-সবখানে। দ্রুত চার্জ হয় এমন ব্যাটারি, বিদ্যুৎ বাঁচানো স্মার্টফোন, হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেলেও ডেটা হারিয়ে না যাওয়া কম্পিউটার-এসবই সম্ভব হবে স্পিনট্রনিক্স প্রযুক্তির মাধ্যমে। আর ভর্টেক্স ও স্কাইর্মিয়ন এই প্রযুক্তির প্রাণ। ভাবুন তো, আগামী দিনের পৃথিবীতে তথ্য সঞ্চয়ের জন্য বিশাল সার্ভার আর দানবীয় হার্ডডিস্কের দরকার

হবে না। কয়েক মিলিমিটার জায়গাতেই ধরে যাবে বিশাল লাইব্রেরি সমান ডেটা। বিদ্যুৎ খরচ হবে খুব কম, তাই পরিবেশও বাঁচবে অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণের হাত থেকে।

উপসংহার

স্পিনট্রনিক্স আমাদের সামনে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। এখানে চার্জ নয়, ইলেকট্রনের স্পিনই হয়ে উঠছে প্রধান চালক। এর ফলে ডিভাইস হবে ছোট, দ্রুত, শক্তি-সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব। আগামী দিনে যখন আমাদের স্মার্টফোন, কম্পিউটার বা ডেটা সেন্টার স্পিন-ভিত্তিক প্রযুক্তিতে চলবে, তখন হয়তো আমরা বুঝতে পারব-ইলেকট্রনের ক্ষুদ্র ঘূর্ণনই মানবজাতির প্রযুক্তির নতুন বিপ্লবের সূচনা করেছে।

## সম্পর্ক

সুপর্ণা ভট্টাচার্য

বিশ্বাস করো সম্পর্ক বিচ্ছেদ থেকেও কষ্টকর হলো
যখন দুটি মানুষ এক পাশে থেকেও এক সাথে থাকে না।

মানসিক দূরত্বের ব্যবধান কয়েক আলোকবর্ষ।

রোজ দেখা হচ্ছে,
কথা হচ্ছে, চাইলেই হাত বাড়িয়ে যাকে পাওয়া যায়,
বলা যায় ‘‘এই আরেকটু বসো না আমার কাছে !’’
কিন্তু বলা যাচ্ছে না ;

বুকের ভেতরকার পাথরটার ওজন প্রতি রাত একটু- একটু করে বেড়ে যাচ্ছে,
প্রতিটি রাত এক - একটি না-বলা কাহিনী
যার শুরু নেই না আছে শেষ
ঠিক যেন স্বয়ম্ভু।

মানুষ আসে - মানুষ যায় ভাগ্য ফেরে
থেকে যায় নিজের ইচ্ছেতে,
ভালোবেসে ভালোবাসায় ;
কিন্তু যদি ভালোবাসাটা হারিয়ে যায়?
বোকা হৃদয় শুধুই প্রশ্ন খুঁজে উত্তরের আশায় - -

বোঝলেন বেণীমাধব!
পৃথিবীতে তারাই অবহেলিত বেশি
যাদের খুশির ভাণ্ড অতি অল্পেতেই পূর্ণ হয়ে যায়।

# কহিলে কথা কালী, আমরা কি তা বুঝতে পারি ?

দধীচি

পূর্বরাগ:

সঞ্জয় বলিলেন:

হে ধৃতরাষ্ট্র! আজ একমহাকাণ্ড ঘটেছে।অস্ট্রেলিয়ান দার্শনিক ডেভিড ক্লার্ক, যিনি সারাজীবন উদ্ভট সব চিন্তাধারা করেছেন, হঠাৎ ইহাজির দধীচি মুনির কুটিরে।কুটিরের সামনে তখন হাঁড়ি ভর্তি খিচুড়ি বসছে, পাড়ার ছেলেরা রেডিওতে রণজিৎ মল্লিকের সংলাপ চালাচ্ছে, আর মুনি ঠান্ডা মাথায় চপ খাচ্ছেন!

ক্লার্ক হাত নেড়ে হাহাকার করে বলিলেন;

'হে মুনি, বাঙালিরা দর্শন ভুলে গেছে! একসময় এরা চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে নিয়ে ঝগড়া করত, হেগেলকে গাল দিত, উপনিষদ পড়ে মাথা ঘামাত। এখন দোকানে ঢুকলেই শোনা যায়;আজ ইলিশ ক'টাকা?' অথবা; 'কে আই'পিএল জিতবে?' এরা কি তবে দর্শন খেয়ে ফেলল?'

দধীচি মুনি হেসে লুচি ছিঁড়ে বলিলেন;

'হে ক্লার্ক, বাঙালি দর্শন ছেড়ে দেয়নি, বরং নতুন দর্শন আবিষ্কার করেছে। তারা বলে;'ঈশ্বর আছেন কিনা জানিনা, তবে ইলিশ যদি সাতশোর নিচে মেলে, তবে অবশ্যই তিনি আছেন।'

ক্লার্ক মাথায় হাত দিলেন;

'হায় হায়! ইংরেজরা এখন শুধু ফুটবল বোঝে, আমেরিকানরা বার্গার গোনে, জার্মানরা গাড়ি বানায়। আমি ভেবেছিলাম, দর্শনের শেষ আশ্রয় বাঙালি। অথচ এরা সকালবেলায় সূর্যোদয় দেখেনা, বরং হোয়াটসঅ্যাপে ফরোয়ার্ড করে, 'Good Morning– Have a Nice Day!'

মুনি হেসে বললেন;

'চিন্তা করোনা, দার্শনিক। তোমার দর্শন আমি এমন ভাবে বাঙালির সামনে রাখব, যেন তারা ভাতের সঙ্গে ঝালঝাল কচুর লতি খাচ্ছে। স্ক্রু (Screw)-আলগা, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান, কফি হাউস, নিউ মার্কেট, অটো ভাড়া;সব ঢুকে যাবে।পাঠক একদিকে হেসে বলবে 'আহা!' আর অন্যদিকে মাথা চুলকে ভাববে - 'আরে সত্যিই তো!'

সঞ্জয় বলিলেন;

এইভাবে দর্শনকে মাছের ঝোলের মতো বাঙালির থালায় পরিবেশন করার অঙ্গীকার করিলেন দধীচি মুনি। আর তারপরই শুরু হইল সেই কাহিনি...

'ঈশ্বর আমায় বলেছেন- এই কাজ করো।' আহা, কী মিষ্টি শোনায় না! কিন্তু ইতিহাস উল্টালে দেখা যায়, এ ইমিষ্টি কথাটার ঘাড়েই চাপানো আছে লাখ লাখ প্রাণের হাহাকার। যুদ্ধ, রক্তপাত, জ্বালাও-পোড়াও-সবই নাকি ঈশ্বরের নামে। ঈশ্বর নিশ্চয়ই ওপর থেকে বিরক্ত গলায় বলেন, 'ধুরমশাই, আমিতো এরকম কিছু বলিনি, আমার নামে এসব কাণ্ডকারখানা কেন?'

আজও অবস্থা আলাদা নয়। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই দেখি, কারও মাথায় কী ভূত চেপেছে কে জানে- সে হাঁকছে, 'ঈশ্বর আমায় বলেছেন, আমি ওর মাথায় হাতুড়ি মারি।' কারও হাতে বাইবেল, কারও হাতে কোরআন, কেউ আবার গুরুজির ঝকঝকে ব্যাখ্যা টেনে আনে। একবার যদি বলা যায় 'ঈশ্বর কানে কানে বলেছেন'- তাহলেই বাকি সব দায় ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপানো সহজ।

কিন্তু মজা এখানেই- আমি যদি বলি ঈশ্বর আমায় বলেছেন, আর পাশের বাড়ির ভদ্রলোক সমান গলায় বলে ঈশ্বর তাঁর সঙ্গেই আড্ডা দিয়েছেন, তাহলে অবস্থা হবে সলিলচৌধুরীর গানের মতো-'তুমি বলো হ্যাঁ, আমি বলি না।' কার ঈশ্বর আসল, কার ঈশ্বর নকল-এই নিয়ে এমন ঝগড়া বাঁধবে যে, পাড়ার মোড়ের দাবার আড্ডাও হার মেনে যাবে।

উদাহরণ তো কম নয়। একই ধর্মের ভেতরেই কেউ বলে- নারীর আসন ঘরে, কেউ বলে-নারীর আসন সমাজে। এদিকে দু'পক্ষই দাবি করছে, 'আমাদের কথাই ঈশ্বরের আসল ইচ্ছা।' শুনে মনে হয় ঈশ্বর বুঝি সত্যিই ডবলশিফটে কাজ করছেন-সকালে একপক্ষকে বলে যাচ্ছেন এক কথা, রাতে অন্যপক্ষকে উল্টোটা। আর এই ঝগড়া মেটাবে কে? আদালতের সু(কু!) খ্যাত উকিলেরও এখানে কুলাবে না।কেউ কেউ তখন খুব গম্ভীর হয়ে বলেন, 'চলুন, এহেম এহেম ধর্মগ্রন্থটা একটু মন দিয়ে পড়ি, তাহলেই সব রহস্য মিটে যাবে।' যেন এহেম এহেম ধর্মগ্রন্থটা কোনো ফেলুদার কেস, একবার গোড়ায় থেকে পড়ে ফেললেই ধরা দেবে আসল খুনি। অথচ অবস্থা হয় এমন- একজন বলে খুনি লালটু, আরেকজন বুক চাপড়ে বলে কালু। শেষ পর্যন্ত রহস্য মেটার আগেই লালটু-কালু দুজনেরই প্রাণসংশয় হয়।

কিন্তু আসল প্রশ্ন থেকে যায়; যদি সত্যিই ঈশ্বর কথা বলেন, আমরা তাঁকে আদৌ বুঝতে পারব কি? আমার মতে, এই বিশ্বাসের সবচেয়ে দারুণ পাল্টা যুক্তি (যদিও একটু ঘুরপথে আসে) পাওয়া যায় দার্শনিক লুডভিগভিট গেনস্টাইনের চিন্তায়। তিনি এক আলোচনায় বলেছিলেন- 'যদি সিংহ কথা বলতে পারত, আমরাতাকে বুঝতেই পারতাম না।' এখন কেউ ভাববেন না, ভিটগেনস্টাইন সিংহ-শিকার বা অরণ্যের সঙ্গে মানুষের কমিউনিকেশন নিয়ে গবেষণা করছিলেন। আসল ব্যাপারটা অন্য।

ভিটগেনস্টাইনের বক্তব্য হলো, যোগাযোগ করার জন্য শুধু শব্দ থাকলেই হয় না, আমাদের আচরণ, অভ্যাস, জীবনযাত্রার অনেক মিল থাকতে হয়। ভাষা হল সবচেয়ে মৌলিক মানবিক কর্মকাণ্ড, আর ভাষা তৈরি হয় মানুষের জীবনযাত্রার ভেতর থেকে। তাই ভাষাকে আলাদা করে বোঝার চেষ্টা করা মানে ঠিক যেন স্রেফ পদার্থবিদ্যার সূত্র মেনে রবীন্দ্রসংগীত বিশ্লেষণ করার চেষ্টা। অমেঘের কোলে রোদ হেসেছেদ; এর ব্যাখ্যা যদি কেউ দিতে বসে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের টেবিল সাজিয়ে, তো শ্রোতা বলবে, 'ধুরমশাই, আপনি বিজ্ঞান পড়ান, গান গাইবেন না।'

ভাষার গঠন আর কাজকর্ম মানুষে রনানান সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজের সঙ্গে জড়িত। যেভাবে রান্না আলাদা করে বুঝতে হলে শুধু মশলার রাসায়নিক গঠন দিয়ে হবেনা; তাতে বাঙালির আলু ভাজা-ভাতের তৃপ্তি বোঝা যাবে না;তেমনি ভাষাকে মানুষের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছাড়া বোঝা যায় না। ভাষা কে কে বল শব্দ-ধ্বনির 'আলাদাবস্তু' হিসেবে ব্যাখ্যা করতে গেলে সেটা হবে যেন বিশাল একছবির সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শুধু বলছি; 'এখানে ৫৫০ ন্যানোমিটারের আলো প্রতিফলিত হয়েছে।' শুনতে বৈজ্ঞানিক, কিন্তু ছবির আসল মায়া একেবারেই উধাও।

যদি ভাষাকে তার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে আলাদা করা না যায়, তবে বাইরে থেকে সেটি চাপিয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। তাই ভাষাকে স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ কিছু ভাবার কোনও মানেই হয় না। যদি এমন হতো, আমরা তা বুঝতেই পারতাম না। ভিটগেনস্টাইনের সিংহ আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে না, কারণ তার সঙ্গে আমাদের কোনও সাংস্কৃতিক মিল নেই। আমরা না তার মতো গর্জাই, না তার মতো শিকার করি। তাই শুধু ভাষাগত বোঝাপড়া নয়, যোগাযোগের আসল বিষয়টাই অনুপস্থিত। আমরা চাইলে

ভিটগেনস্টাইনের কথাটায় একটু রঙ চড়িয়ে বলতে পারি;সিংহের যদি সত্যিই বলার মতো কিছু থাকত ও, আমাদের বুঝবার সাধ্য থাকত না, আর তার বলারও কিছু থাকত না।

তবে এর মানে এই নয় যে প্রাণীর সঙ্গে যোগাযোগই সম্ভব নয়। যার ঘরে কুকুর-বিড়াল আছে সে জানে ওরা কী চমৎকার ভাবে নিজেদের দাবি স্পষ্ট করে জানাতে পারে। আমারই দুটো বিড়াল আছে;নানা, আসলে আমি-ইওদের চাকর-বাকর। ওরা যখন খেতে চায়, তখন এমন চোখ করে তাকায় যে আমি মনে করি যেন ফরাসি দার্শনিক রুশো নীতিবাক্য শোনাচ্ছে। রোদ্দুরে গাএলিয়ে দেবার সময় হলে ওরা আমাকে বিছানা সরিয়ে দিতে বাধ্য করে। আমিও ডেকে বলি, 'এসে খাবার খেয়ে উদ্ধার কর'- ওরা তখন বুঝেফেলে। কিন্তু এখানেই শেষ। ওরা বিদ্রূপ বোঝে না, শিল্প-সাহিত্যের স্বাদ নেয় না, মিথ্যে বলে না। আর আমি তো তাদের কাছে বসে অফিসের কাগজপত্রের যন্ত্রণা বা হোমলোন শোধ করার দুঃশ্চিন্তা উজাড় করে বললেও কোনও লাভ নেই। আমার বিড়াল তখন হাই তুলে বলে, 'আচ্ছা বাবা, আমাদের খাবারটা আগে দাও।'

কেউ বলতেই পারে, 'ভাষা তো শিখতে পারি, তবে সিংহের ভাষা শেখা যাবে না কেন? যেমন একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ খুঁজে পাওয়া অচেনা ভাষা শিখে নেয়।' উত্তর হলো;না বাবাজি, হবে না। কারণ হারানো ভাষা আমরা বুঝতে পারি আমাদের অভিন্ন মানবীয় আচরণ ধরে। যারা সেই ভাষায় কথা বলত, তারা খেত, সংসার সামলাত, বাড়িঘর বানাত, ঝগড়া মেটাত;এইসব কর্মকাণ্ড থেকেই তাদের ভাষার জন্ম। আর সেই কর্মকাণ্ডের সঙ্গেই আমরা সম্পর্ক খুঁজে পাই। সিংহের সঙ্গে কিন্তু এসবের কোনও মিল নেই। হ্যাঁ, সিংহও খাবার জোগাড় করে, আর এদিক থেকে একটু মিল খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়;সিংহের খাবার ধরা আর মানুষের খাওয়া, এ দুইয়ের মধ্যে ফারাক আকাশ-পাতাল। সিংহ মাটিতে গলা চেপে হরিণ মারে, আর আমরা হাটে গিয়ে বাজারের দোকানদারদের সঙ্গে দরাদরি করি। সিংহের জন্য খাওয়া মানে দাঁত-নখর চালানো, আর আমাদের জন্য খাওয়া মানে হাজারো অনুষ্ঠান;সবজি ধোওয়া, মশলাবাটা, ভাত চাপা, 'আজ ডিম কারি হবে না মাছ ঝোল হবে' নিয়ে সংসারের ভেতর মহাযুদ্ধ। খাওয়ার সময়ও আমাদের নানারীতি;কে আগে নেবে, কে পরিবেশন করবে, কার কপালে ইলিশের মাথাটা উঠবে।

এমন জটিল সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠান সিংহদের নেই। ফলে আমাদেরসঙ্গে তাদের খাওয়ার মিল খুঁজে পেলে সেটা হবে একেবারে যেমন;'তুমি হাঁটো, আমিও হাঁটি, তাই আমরা একই রকম';এরকম দারুণ যুক্তি। অথচ একজন হাঁটছে কফিহাউসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে, আরেক জনহাঁটছে বনের ভেতর দাঁত বের করে শিকার তাড়া করতে। দু'জনের হাঁটার মিল ঠিক কতখানি তা ভাবলেই মজা পেয়ে যাবেন। যদি কোনও পশু আমাদের সঙ্গে কথা বলতে না পারে, তবে ঈশ্বরের ব্যাপারে কী বলা যায়? অনেকে বলেন, ঈশ্বর তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন;কখনও পবিত্র গ্রন্থের ভেতর দিয়ে, কখনও প্রকৃতির ইশারায়। বাইবেলের পাতায় তো সোজাসুজি লেখা আছে;'প্রভু এই বলছেন।' কিন্তু ভাই, যদি সিংহই আমাদের সঙ্গে কথা বলতে না পারে, তবে ঈশ্বর তো আরও একধাপ দূরে।

সিংহের সঙ্গে অন্তত এতটুকু মিল আছে যে আমরা একই পৃথিবীতে থাকি, একই রোদ্দুর-বৃষ্টিতে ভিজি, একই ক্ষুধা-তৃষ্ণা সামলাই। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে সেইটুকুও নেই। ফলে ভাষা ব্যবহার করে যোগাযোগের যে মৌলিক শর্ত দরকার;যে শর্তে মানুষের সঙ্গে মানুষের কথা হয়;সেটাই নেই ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে। এর মানে এই নয় যে মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত, স্নেহবোধে ভরা, ক্ষমার আশ্রয় পাওয়া, শক্তি

পাওয়া বা আত্মপক্ষ সমর্থিত হওয়ার অনুভূতি পেতে পারেনা। কিন্তু ঈশ্বর সোজা মুখে এসে বলতে পারবেন; 'দেখো, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম';এমনটা ঘটার উপায় নেই।

আসলে আমাদের ভাষা-ভাবনার মধ্যেই গলদ আছে। আমরা ভাবি ভাষা মানেই মনের ভেতরের কথা অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম। যেন ভাষা একটা খাম, তার ভেতরে চিন্তা ঢুকিয়ে দিলেই ডাকঘর হয়ে অন্যের কাছে পৌঁছে যাবে। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা অনেক বেশি কিচিরমিচির, অনেক বেশি চায়ের টেবিলের আড্ডার মতো, যেখানে আসল কথার পাশাপাশি রসিকতা, ভণিতা আর খানিক চা-দুধের ঝাঁঝও মিশে থাকে।

আমরা সাধারণত ভাবি ভাষার মধ্যে দু'টো ধাপ আছে;একটা ভেতরের, মানে আমাদের ভাবনা; আরেকটা বাইরের, মানে কথায় প্রকাশ। মনে হয় যেন আগে মাথায় বাক্য গড়ে উঠছে, তারপর সেটা মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়; এটা বেশির ভাগ সময় ঠিক চলে না। সত্যি কথা বলতে কী, বেশির ভাগ সময় আমরা স্রেফ বলে ফেলি। 'বৃষ্টি হচ্ছে'; এই কথাটা বলার আগে আমি কোনও সভা ডেকে মাথার ভেতর একলাইন লিখে রাখিনা। আমি যেমন বললাম, অপরজনও তেমন শুনল। সে আর বসে ভাবে না; 'আচ্ছা, কথার আড়ালে আসল মনের ভাব কী?'

হ্যাঁ, যদি সেভাবে আমার কথায় শুধু আবহাওয়ার খবর নয়, আরও কিছু আছে, তবে সেটা আমার চিন্তাবিশ্লেষণ করে নয়, বরং আমার ভঙ্গি-ভাষা দেখে। ধরুন আমি যদি গলা নামিয়ে বলি, 'বৃষ্টি হচ্ছে'; মুখের ভাব কাঁচুমাচু, কাঁধ ঝুলে পড়েছে;তাহলে শ্রোতা এক ঝটকায় বুঝবে, তওহে, তোমার মন খারাপ হয়েছে। 'আসলে সে আমার দুঃখটাই ধরে ফেলবে আমি নিজে স্বীকার করার আগেই। এখানেই আসল ফাঁকিটা ধরা পড়ে। যদি আমরা যুক্তির খাতিরে ধরে নিই ঈশ্বর সত্যিই ভাষায় আমাদের সঙ্গে কথা বলেন; ধরা যাক ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে;তবু ঝামেলা থেকেই যায়। কারণ ঈশ্বরের তো আমাদের মতো মুখভঙ্গি নেই, কণ্ঠস্বর নেই, দেহভঙ্গি নেই। ফলে সেই ভাষায় সবকিছু থাকলেও আসল যোগাযোগের যে মশলা;যেটা বাঙালির আড্ডায় চায়ের সঙ্গে বিস্কুট না থাকলে যেমন ফাঁকা লাগে;সেটাই অনুপস্থিত।

ধরে নিলাম, ভাষা মাঝে মাঝে চিন্তার মোড়ক হয়ে ওঠে। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে সেটার কোনও লাভ নেই। কারণ ভাষা কাজ করে তখনই, যখন দু'পক্ষের ভাষার জমি একই রকম। অথচ ঈশ্বরকে মানুষের থেকে যে জিনিসগুলো আলাদা করে;সর্বজ্ঞতা আর সর্বশক্তিমান হওয়া;সেগুলোই তো আমাদের ভাষার জমি আলাদা করে দেয়। ঈশ্বর যদি সব জানেনেই, তবে সীমিত মানুষক'টা জানলেও বা কী হলো? তাঁর চিন্তার সঙ্গে আমাদের চিন্তার ফারাক যে গঙ্গা-যমুনা নয়, সরাসরি আটলান্টিক মহাসাগর! সিংহের সঙ্গে আমাদের ভাষার দূরত্ব যতোখানি, ঈশ্বরের সঙ্গে তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি।

কেউ হয় তো বলবেন, 'ঈশ্বর তো সবই পারেন, চাইলে নিশ্চয়ই মানুষের সঙ্গে কথা বলতেও পারবেন। দআহা, এযুক্তি তো নিজের পায়ে কুড়াল মারা। আপনি যতই ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান ক্ষমতার দিকে ইঙ্গিত করবেন, ঈশ্বর ততই আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবেন।

একটা তুলনা দেওয়া যাক। আমরা মানুষ কুকুর-বিড়ালের সঙ্গে খানিকটা যোগাযোগ করতে পারি; তওই শোন, মিউমিউ করছে, মানে খেতে চায়। দআবার কুকুরও ঘেউঘেউ করে জানায়, 'এ বাড়ির বাইরে কেউ ঢুকছে।' কিন্তু পিঁপড়ে বা মশার সঙ্গে তো আর বসে গল্প করা যায় না। ওরা যদি সংসদ গড়তে বসে, আমরা কিচ্ছু টের পাব না। ঠিক তেমনি ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের দূরত্বটা কুকুর-বিড়ালের সঙ্গে নয়, বরং

একেবারে পিঁপড়ের সঙ্গে মানুষের দূরত্বের মতো।

অর্থাৎ, ঈশ্বর যদি চানও, তবু সেই দূরত্বটা আমাদের জন্য এত বিশাল যে যোগাযোগের নাম করে যা হয় সেটা হবে শুধু কল্পনা, আর আমরা শুধু মাথা চুলকাব;'এটা কি ঈশ্বরের কথা, না আমাদেরই কানে বাঁশি বাজছে?'

ভাষা চলে শুধু তখনই, যখন সেটা সঠিক সামাজিক মঞ্চে বসানো হয়। ধরুন আমি হার্ডওয়্যারের দোকানে ঢুকে বললাম;'দুই ডজন একইঞ্চি ব্রাস সেলফ-ট্যাপার দিন।' দোকানদার একটুও মাথা চুলকাবে না, গুদাম থেকে মাল বার করতে করতে দিব্যি পাশের ছেলেকে বলবে;'শুনেছিস তো, ছুটিতে দিঘায় গিয়ে কী কাণ্ড করলাম!' মানে আমার কথার আসল উদ্দেশ্য ছিল কাজ উদ্ধার করা, ব্যাকরণ শোনানো নয়। কিন্তু যদি আমি রবিবার গির্জায় বা সোমবার সকালে কালীঘাট মন্দিরে দাঁড়িয়ে একই কথা বলি;'দুই ডজন ব্রাসসেলফ-ট্যাপার দিন';তাহলে লোকজন চমকে যাবে। কেউ ভাববে, 'লোকটার মাথায় ইস্ক্রু নেই, এখন আবার স্ক্রু খুঁজছে।' অন্য কেউ হয় তো প্রার্থনা ছেড়ে হেসে গড়াগড়ি যাবে।

অত এব বোঝা গেল, ভাষা একেবারে টুলবক্সের হাতিয়ার;সঠিক জায়গায় ব্যবহার না করলে ধোপে টিকবে না। আর এইসব সামাজিকপ্রেক্ষাপট যে একদিনে গড়ে ওঠেনি;তা তো পাড়ার আড্ডার মতোই বহু বছরেরজমাট বাঁধা ব্যাপার। আমি আজ স্ক্রু চাইতে পারছি কারণ বহু যুগ ধরে মানুষ মাপঝোক শিখেছে, ব্যবসা করেছে, দোকান খুলেছে, বাজারে ঠকেছে, ঠকিয়েছে। এখন ভাবুন তো, যদি ঈশ্বর সত্যিই আমাদের সঙ্গে কথা বলেন, সেটা কোন প্রেক্ষাপটে মানে পাবে? উনি তো কখনও নিউমার্কেটে গিয়ে ডাল-চাল কিনেন নি, ট্রেনে টিকিট কেটে কামরার বাইরে ঝুলে আসেননি, কিংবা অটোওয়ালার সঙ্গে ভাড়ার জন্য ধস্তাধস্তি করেননি। ফলে ঈশ্বরের ভাষা আমাদের কানে পড়লে সেটা হবে যেন ক্রিকেট মাঠে হঠাৎ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দাঁড়িয়ে গেছে;দেখতে দারুণ, কিন্তু খেলার ধারায় একেবারে বেমানান।

ধরা যাক, ঈশ্বর বললেন;'তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো।' বাহ, শুনতে কি সুন্দর! কিন্তু আদেশ মানে কী? আদেশ মানে এমন এক অবস্থা যেখানে একজন আদেশ দিতে পারেন আর অন্যজনকে সেটা মানতেই হবে;অথবা অন্তত মানা উচিত। শুনতে সহজ, কিন্তু আসলে ভীষণ জটিল।

ধরা যাক, আমার অফিসের বস যদি কাজের সময় বলেন;'তুমি আমার ড্রাইক্লিনিংটা নিয়ে এসো'; আমি করব, কারণ কর্মচুক্তি, দায়িত্ব ইত্যাদিসব মিলিয়ে তাঁর কথাটা আদেশ হিসেবে মানে পায়। কিন্তু যদি উনি অফিস শেষের পর বললেন;'ড্রাইক্লিনিংটা নিয়ে এসো';তখন সেটা আর আদেশ নয়, বরং অনুগ্রহ। হয়তো তার বদলে উনি বলবেন, ত্কাল আধাদিন ছুটিনাও।' মানে আদেশ আসলে সবসময়ই নির্দিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাঁধা। এখন আসি ঈশ্বরের কথায়। ঈশ্বরের আদেশের ক্ষেত্রে সমস্যা হলো;আমাদের সঙ্গে তাঁর তো কোনও সামাজিক প্রেক্ষাপট নেই। তিনি তো অফিসের বস নন যে প্রমোশনের ভয় দেখাবেন, আবার শ্বশুরবাড়ির মাসি-পিসিও নন যে না মানলে রাগ করে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। ফলে ঈশ্বরের আদেশ আসলে মানে পায় কে বল তখনই, যখন সেটা মানুষের আদেশের ছায়া হয়ে ওঠে।

আসলে ঈশ্বরের আদেশগুলো মানে হয় কেবল তখনই, যখন আমরা মানুষরাই সেটাকে নিজেদের আদেশ বানাই। ইতিহাসে যত ঈশ্বর-নির্দেশের গল্প, সবই তো মানুষরাই মানুষের কানে শোনাচ্ছে;'ঈশ্বর একথা বলেছেন।' মানে আদেশটা দেবতার নয়, এজেন্টটা মানুষই।ঈশ্বরের আদেশ মানে তাই বিশেষ ধরনের মানব-আদেশ। তার মানেটুকু টিকে থাকে কেবল সেই দীর্ঘ সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে,

যেখানে মানুষই ঈশ্বরের হয়ে ভাষণ দেন।

অতএব 'ঈশ্বরের আদেশ 'বলতে যা বোঝানো হয়, আসলে তা মানুষের আদেশেরই একখানা নতুন ব্র্যান্ডিং। যেমন আলুর দম আর দম-আলু আলাদা নাম হলেও থালায় খেলে বুঝবেন;মশলাটা তো একই। চলুন আবার ফিরি ভিটগেনস্টাইনের সেই সিংহের কাছে। ধরুন, একদিন সত্যিই সিংহের মুখ থেকে ঝরঝর করে বোধগম্য ভাষা বেরোতে শুরু করল। তখন নিঃসন্দেহে বলা যাবে;সিংহ নয়, আসলে মানুষই বলছে। একই ভাবে, কেউ যদি দাবি করে;'ঈশ্বর আমার সঙ্গে কথা বলছেন' বা 'ঈশ্বর আমার মাধ্যমে বলছেন'; তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখুন, আসলে মানুষই বলছে। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, ভদ্রলোক (হ্যাঁ, বেশির ভাগ সময় পুরুষই) বুঝে গেছেন তাঁর কথাটা এতটা বেয়াড়া আর বোকাটে যে, সেটাকে জোর খাটাতে হলে ঈশ্বরের সীলমোহর দরকার। সংক্ষেপে, ঈশ্বরের ভাষা শোনে কারা? শুধু তারা, যাদের দুঃসাহস আছে নিজের স্বার্থ আর আত্মপ্রসাদকে ঈশ্বরের বাণী বলে চালিয়ে দেওয়ার। যেন একেবারে গলি ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন নিজেকে ভেবে বসেছে;'আমি-ই ভারতীয় দলের অধিনায়ক, শুধু বাকি দেশটা জানে না।'

সমাপনী:

সঞ্জয় বলিলেন;

হে ধৃতরাষ্ট্র! এত কথা কয়ে শেষে দধীচি মুনি ক্লার্ককে বলিলেন;

'দেখো দার্শনিক, ঈশ্বরের ভাষা আমরা বুঝব না;এটাই স্বাভাবিক। কারণ আমরা তো এখনও নিজেদের স্ত্রীর ভাষাই অর্ধেক বুঝি, শ্বশুরবাড়ির ভাষা পুরোপুরি ভুল বুঝি, আর অফিসের বসের ভাষা ইচ্ছে করে না-বুঝি।এই অবস্থায় ঈশ্বর যদি সত্যিই কিছু বলেন, তাহলে সেটা যে কারও শাশুড়ির উপদেশের মতোই;শোনা যায়, কিন্তু মানা যায় না।'

ক্লার্ক তখন হেসে বললেন;

'হে মুনি, এতদিনে বুঝলাম;ঈশ্বরের চেয়ে ভয়ংকর আসলে মানুষের নিজের ব্যাখ্যা!'

সঞ্জয় বলিলেন;

এইভাবে আলোচনার শেষ হইল। ঈশ্বর কিছু বললেন কিনা, তা অজানা রইল। কিন্তু দধীচি মুনির কথায় স্পষ্ট হলো;বাঙালিরা দর্শনকে যতই উল্টো পাল্টা করুক, ইয়ার্কি তারা ছাড়বে না।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

Clarke, D. (2016). If God could talk, we wouldn't be able to understand him. Think, 15(44), 15-22.

Ellis, D. (2025). If an alien could talk, could we understand it?. In Exophilosophy (pp. 115-127). Routledge.

## চলো আকাশ হয়ে যাই

মিতালী দে

আকাশের কতো রঙ
আকাশ নীল
তার সাথে আরেক রঙ মিলে মিশে
আরেক নীল আরও রঙ মাখামাখি করে
গাঢ় নীলে, সাদা ধূসর মেখে
গোধূলী বেলার লালে আকাশের সাজে !

আকাশের ছায়া সাগরের জলে
তবুও জোয়ার ভাটায়, তবুও সুনামীর উচ্ছ্বাসে
রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ভাসিয়ে নেয়া প্রান্তরে।

আর মাটি আঁকড়ে থাকা দেশ মহাদেশ
এদেশ সেদেশের বুকে হেঁটে চলা সভ্যতা ?
তারা আকাশ চেনে না,
বুকের বিস্তারে কলকল ঝর্ণার গান নেই,
ময়ূরের তীক্ষ্ণ সুন্দর কেকাধ্বনি নেই,
নিরালাপথের পাশে বুনো ফুল নেই,
শুধু দাবানলে শুধু লাভাস্রোতে
পুড়িয়ে ছারখার করে কতো প্রাচীন স্থাপত্য
অতীতের বুনে যাওয়া নিবিড় ইতিকথা,
দখলদারীর তীব্র হিংস্র নেশাস্রোতে
স্বেচ্ছাচারীরা ওড়াওড়ি করে, রক্তে ভাসে মাটি
তারা অসীম অনন্ত সত্যে ভেসে চলা
আকাশ জানে না।
তারা আকাশের রঙ দেখে না।

# নিশীথ প্রদীপ

অস্মিতা দে

হেরিনু চারপাশে অপূর্ব হৃদি আশে,
জাগিছে জীবন নব জ্যোতির আশ্বাসে !
আপন জগৎ ছিল খেলিত আনমন,
বাহিরে জীবন বুঝি ক্ষুদ্র সে বাতায়ন -
হৃদয় জগৎ মাঝে এত দ্দ ছিল দ্বার !
বুঝিনি কোনোদিন এত যে প্রাণ তার !
আজিকে বিশ্বমাঝে এ কোন মায়াছলে -
ফোটালে প্রাণ মম শতত শতদলে ।
ফাগুন বাতাস বেশে আঁধার ঘরে এসে,
জাগালে নিমেষ শেষে জ্যোতির সম্ভার ।
রজনীর আঁধার বাঁধা - অলোকে লাগিছে ধাঁধা,
নীরব স্তব্ধ দেহে প্রাণের সঞ্চার !
রুদ্ধ দ্বারে জাগে ভাঙনের উপহার ।

অতল গভীর হতে উঠিছে প্রবল ঢেউ -
ঘুমন্ত গিরিবরে আগুন জ্বালিছে কেউ,
শুষ্ক মাটির পরে মেঘের হুঙ্কার !
প্রস্ফুটিত প্রাণ আজ বিশ্ব পারাবার ।

জগৎসভা মাঝে পেনু যে পুণ্য ঠাঁই,
ভারতী পদে সঁপি জীবন অর্ঘ্য তাই ।
দেশের তরে হোক নতুন জন্ম আজ,
তোমার সেবায় হোক আমার প্রথম কাজ ।
আশীষ দেহো তবে- মহার্ঘ্য অনুভবে,
জ্বলিছে যেমন করে নিশীথ প্রদীপ ওই,
তোমারি লাগি যেন তেমনি জেগে রই।।

## অভিনয়ের জীবন

অনন্যা ভট্টাচার্য

অভিনয়ে বেঁচে থাকা আমরা,
কবেই যেন একে বাস্তব ভেবে বসে আছি।
হাসির অভিনয়, অশ্রুর অভিনয়,
অভিমান লুকিয়ে ক্ষমার অভিনয়।

প্রতিটি সম্পর্ক একেকটা নাটক,
যেখানে আমরা চরিত্র;
কেউ নায়ক, কেউ খলনায়ক,
কেউ বা দর্শকের আসনে নীরব দর্শন।

প্রেমের অভিনয়; মিষ্টি কথায় মোড়া,
আবার ঘৃণার অভিনয়; নীরব চোখের ইশারায় ভরা।
ভালো থাকার অভিনয়, ভালো রাখার অভিনয়,
যেন প্রতিদিন এক অদৃশ্য মহড়া।

দিন শেষে যখন একা হই,
মুখোশ খোলার সাহস হয় না।
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
নিজেকেই জিজ্ঞাসা করি;
কে আমি? কোনটা সত্যি, কোনটা অভিনয়?

আমরা রাগ দেখাই, অথচ ভিতরে ভয় লুকাই,
আমরা শক্তির ভান করি, অথচ ভেঙে পড়ি অগোচরে।
হাজারো অনুশীলন শেষে
আমরা একে অপরকে দেখাই শুধু সাজানো দৃশ্য,
যেখানে সত্যি অনুভূতি থাকে
আড়ালে, পর্দার আড়ালে।

স্বপ্নের অভিনয়, আশার অভিনয়,
আত্মবিশ্বাসের অভিনয়, হারের অভিনয়।
শিশু যেমন খেলার ছলে ভূমিকায় মাতে,
আমরাও জীবনের মঞ্চে
এক অভিনয় থেকে আরেক অভিনয়ে ঘুরে বেড়াই।

শেষ অঙ্কে বুঝি,
নাটক যতই দীর্ঘ হোক;
তবু করতালির পর সব আলো নিভে যায়,
এবং তখনই নগ্ন হয়ে ওঠে
সত্যি মুখ, সত্যি হৃদয়।

## শান্তি

অপরাজিতা নাথ

অতীত নিয়ে বিভ্রান্ত,
ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত।
বর্তমান শান্তির খোঁজে
শ্বাসকষ্টে দম বন্ধ।

একটু শান্তির খোঁজে,
আস্ত জীবন দিলাম পাড়ি।
শত-শত দুঃখ কষ্টের,
সাথে আজ আড়ি।

নিজের কাছে নিজের প্রশ্ন,
একা বসে অন্ধকারে।
চুপ করে থেকে দেখলাম,
শান্তি কোথাও নেই যে।

তারপরও ছুটে চল্লাম,
শান্তির সন্ধানে।
কোথায় পাবো শান্তি,
ভাবছি বসে নিভৃতে।

# প্রি জাজমেন্ট

কপিল দেব

‘দয়া করে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারি। দিঘা থেকে পুরীগামী ট্রেন নম্বর ২-২-৮-৮-৯, সমুদ্র কন্যা এক্সপ্রেস, কিছুক্ষণের মধ্যেই চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছাবে।’

লাউডস্পিকারের ঘোষণাটা রাতের ব্যস্ততার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। ভুবনেশ্বর স্টেশন রাতের বেলায় নিস্তব্ধ নয়, বরং একটা জমজমাট ভাব। একের পর এক ট্রেন আসছে, প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের ভিড়, মানুষজনের কোলাহল, আর ঘোষণার শব্দে মুখরিত। ভুবনেশ্বর থেকে পুরীর দূরত্ব অনেক হলেও, রাতের বাতাসে সামুদ্রিক লবণের হালকা ছোঁয়া পাওয়া যায়, যেন সমুদ্রের হাওয়া এখানে এসে মিশেছে। প্ল্যাটফর্মের মলিন হলুদ আলোতে সুমিত তার বাবা-মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে। তার পরনে হালকা নীল শার্ট, কলারে ঘামের দাগ, হাতে একটা ছোট ব্যাগ, যার জিপারে একটা পুরনো চাবির রিং ঝুলছে। তার বোন পাশে বসে, কানে ইয়ারফোন গোঁজা, মোবাইলে গান শুনছে। তার পরনে ফিকে গোলাপি কুর্তি, চুলে একটা সাধারণ ব্যান্ড। ঘোষণার পনেরো মিনিট পর ট্রেন আসবে, তাই তারা তৈরি হচ্ছে। সুমিত তার ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিল, বাবা-মা তাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছেন, আর তার বোন ইয়ারফোন খুলে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকাল।

সুমিত প্ল্যাটফর্মের ব্যস্ততার মাঝে চোখ বোলাতে গিয়ে এক কোণে নজর পড়ল। একটা ঝাপসা আলোর নিচে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। তার চুলে ধুলো জমে আছে, কাঁধে একটা পুরনো ঝোলা, যার স্ট্র্যাপটা কিছুটা ক্ষয়ে গেছে। পরনে একটা সাধারণ ধূসর শার্ট, কলারটা একটু উঁচু হয়ে আছে, প্যান্টের একপাশে হালকা দাগ। পায়ে জীর্ণ স্যান্ডেল, যেন অনেক পথ ঘুরে এসেছে। তার দৃষ্টি অস্থির, বারবার চারপাশে তাকাচ্ছে, যেন কিছু খুঁজছে বা কাউকে এড়াতে চাইছে। সুমিতের মনে হয়, এই ছেলেটির মধ্যে কিছু গোপন উদ্দেশ্য আছে।

‘দিদি, ওই ছেলেটাকে দেখ, ‘সুমিত ফিসফিস করে।’ ও নিশ্চয়ই চোর। দেখ, ওর হাবভাব দেখালেই বুঝা যায়। ও কিছু একটা প্ল্যান করছে।’ তার বোন ইয়ারফোন খুলে হাসে, ‘তোর শুরু হয়ে গেল বুঝি? থাম তো!’ কিন্তু সুমিতের মন অন্য কথা বলছে। তার মাথায় একটা অদ্ভুত ক্ষমতা কাজ করছে মানুষের হাবভাব, চোখের দৃষ্টি, চলাফেরা দেখে সে যেন তাদের মনের উদ্দেশ্য পড়ে ফেলতে পারে। এই ছেলেটির অস্থিরতা, চোখের চোরা দৃষ্টি সব মিলিয়ে সুমিত নিশ্চিত, এ একজন চোর।

ট্রেন এসে পড়ে। সুমিত, তার বোন আর বাবা-মা কামরায় ওঠে। আশ্চর্যের বিষয়, ওই ছেলেটিও তাদের কামরায় উঠে। সুমিতের বুক ধক করে ওঠে। ‘দেখলি, আমি ঠিক বলেছিলাম,’ সে ফিসফিস করে। কিছুক্ষণ পর অন্য কামরা থেকে হইচই শুরু হয়। সুমিত কৌতূহলী হয়ে উঠে যায়। একজন টিটি ছুটে আসছে, হাতে মোবাইল। সুমিত জিজ্ঞেস করে, ‘কী হয়েছে, স্যার?’ টিটি বিরক্ত মুখে বলে, ‘একটা চোর ধরা পড়েছে। ব্যাগ চুরি করেছিল, কিন্তু পালাতে পারেনি।’ সুমিতের কৌতূহলী চোখ দেখে টিটি মোবাইলে একটা ছবি দেখায়। সুমিতের মুখে হাসি ফোটে। তার ধারণা ঠিক। আবারও।

কালীপুর গ্রামের ধুলোমাখা রাস্তার এক কোণে শম্ভুনাথ মুখার্জির ক্লিনিক। টিনের চালার নিচে একটা পুরনো সাইনবোর্ড ঝুলছে, যেখানে লেখা: শম্ভুনাথ মুখার্জি, আর এম পি এবং আরও অনেক কিছু। সাইনবোর্ডের রং ফিকে, অক্ষরগুলো মলিন। সুমিত ক্লিনিকের বাইরে একটা কাঠের বেঞ্চে বসে আছে। তার পরনে সাদা শার্ট, কলারে ঘামের দাগ। হাতে একটা ফাইল, যার কোণে একটা ছোট্ট কালির দাগ। এটা তার

প্রথম চাকরি একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। প্রতিদিন ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলতে হয়, ওষুধের প্রচার করতে হয়। প্রতিবারই তার বুক কাঁপে যদি ভুল হয়? যদি তার কথা কেউ না শোনে?

ক্লিনিকের সামনে একটা ছোট ফার্মেসি। কাউন্টারে বসে আছেন একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক। তার পরনে ফিকে নীল শার্ট, কাঁধে পাতলা গামছা। চোখে পুরনো ফ্রেমের চশমা, হাতে একটা ছোট টিভির রিমোট। টিভিতে একটা বাংলা গান বাজছে, কিন্তু তার চোখ ঝিমুনি। সুমিত উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ডাক্তারবাবু কখন আসবেন?' ভদ্রলোক মাথা নাড়েন, 'একটু দেরি আছে। বসুন।'

সুমিত ফিরে এসে বেঞ্চে বসে। তার মন অস্থির। সে ভাবছে, শম্ভুনাথ এলে কীভাবে কথা শুরু করবে। তার ফাইলে কোম্পানির ওষুধের তালিকা, কিন্তু সে জানে না কীভাবে আরএমপি-র মন জয় করবে। তার মাথায় ভয় যদি শম্ভুনাথ তার কথা না শোনেন? যদি তাকে বকেন? এই চাকরিটা তার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা তার মনে পড়ে। সে মনে মনে ভাবছে, প্রথমে কোম্পানির নাম বলবে, তারপর ওষুধের গুণাগুণ। কিন্তু যদি শম্ভুনাথ ব্যস্ত থাকেন? যদি তাকে সময় না দেন?

একটা মোটরবাইকের শব্দে সুমিতের ধ্যান ভাঙে। একজন মানুষ বাইক থেকে নামলেন। তার পরনে সাদা-কালো প্রিন্টের শার্ট, শার্ট কোমরে গোঁজা নয়। প্যান্টটা ঢিলেঢালা, পায়ে সাধারণ কালো চটি, যার একটা ফিতে ছিঁড়ে গেছে। তার চুলে তেলের চকচকে ভাব, কিন্তু কপালে ঘামের ফোঁটা। কাঁধে একটা ছোট কালো ব্যাগ। সুমিত ভাবল, এ নিশ্চয়ই কোনো পেশেন্ট। মানুষটি সোজা চেম্বারের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন, 'এই, ভেতরে এসো।'

সুমিতের পাশ থেকে একটা মেয়ে উঠে দাঁড়াল। সুমিত এতক্ষণ খেয়ালই করেনি যে তার পাশে কেউ বসে ছিল। মেয়েটির বয়স বোধহয় ২৫-২৬, পরনে সবুজ সালোয়ার-কামিজ, কিন্তু কাপড়টা মলিন, কোণে একটা ছোট ছেঁড়া দাগ। তার চুলে একটা সাধারণ কালো ক্লিপ, মুখে একটা ক্লান্ত ভাব। হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ, যার ভেতর থেকে একটা পুরনো তোয়ালের কোণ বেরিয়ে আছে। তার হাঁটার ধরনে অস্বাভাবিকতা বাঁ-পা একটু টেনে টেনে হাঁটছে, ডান পা যেন একটু বেঁকে যাচ্ছে, যেন প্রত্যেক পদক্ষেপে তার শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। তার পায়ের চলন দেখে মনে হয় যেন কোনো পুরনো আঘাতের ফলে হাঁটতে গেলে একটা অদৃশ্য বাধা অতিক্রম করতে হচ্ছে, যার ফলে তার গতি ধীর এবং অসমতল। সে ধীরে ধীরে চেম্বারের দিকে এগিয়ে গেল, প্রত্যেক পদক্ষেপে তার শরীরের ভার একপাশে ঢলে পড়ছে, যেন সে নীরবে একটা অদৃশ্য যুদ্ধ লড়ছে। তার মুখে একটা নীরব কষ্টের ছায়া, চোখে একটা শান্ত ধৈর্য। সুমিতের মনে হলো, এই মেয়েটির জীবনে কী যেন একটা ভারী গল্প আছে।

একটা হাফপ্যান্ট পরা ছেলে হুট করে ক্লিনিকের সামনে এসে দাঁড়াল। তার বয়স বোধহয় ৩৫-৪০ এর মধ্যে, পরনে লাল-কালো চেক শার্ট, একটা হাতা গুটানো, আরেকটা খোলা। পায়ে চটি, চুলে ধুলো জমে আছে। তার হাতে একটা ছোট প্লাস্টিকের প্যাকেট, যার ভেতর কী যেন ঝনঝন করছে। সে ফার্মেসির ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে চোখে ইশারা করল একটা দ্রুত, গোপন ইশারা। ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, যেন কিছু বুঝে গেছেন। ছেলেটি সোজা চেম্বারে ঢুকে গেল।

সুমিতের মনে একটা খটকা লাগল। এই ইশারার মানে কী? তার মাথায় একটা ছবি তৈরি হতে শুরু করল। মেয়েটি, যে ধীরে ধীরে হাঁটছিল, তার শারীরিক অবস্থা। ছেলেটি, যে গোপনে ইশারা করল। আর শম্ভুনাথ, যিনি ডাক্তার নন, শুধু আর এম পি। এই ক্লিনিকে কিছু গোপন কাজ চলছে। হয়তো মেয়েটি

গর্ভবতী, আর এই ছেলে তার জন্য দায়ী। শম্ভুনাথ হয়তো অ্যাবরশনের কাজ করেন। সুমিতের মনে হলো, এই লোকের সঙ্গে কথা বলা সহজ হবে। সে তো ডাক্তারই নন! তার ভয় কেটে গেল। সে ভাবল, যদি শম্ভুনাথ এমন কাজ করতে পারেন, তাহলে তার কোম্পানির ওষুধ বিক্রি করানো কোনো বড় ব্যাপার নয়। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলাটা যতটুকু কষ্টকর, ভয়ের বিষয়, শম্ভুনাথের ক্ষেত্রে এখন আর বিষয়টি একই রইল না। শম্ভুনাথ যেন সুমিতের চোখে এখন আর-ছারটা মানুষের মত সাধারণ হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ পর ছেলেটি বেরিয়ে এসে ফার্মেসির ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করল, 'ওই ওষুধটা আছে?' তার কণ্ঠে তাড়াহুড়ো। ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'না, এখানে নেই। অন্য ফার্মেসিতে দেখো।' ছেলেটি বিরক্ত মুখে বেরিয়ে গেল, তার চটির শব্দ ধুলো উড়িয়ে। সুমিতের ধারণা আরও পোক্ত হলো। ছেলেটি নিশ্চয়ই অ্যাবরশনের পরের ওষুধ খুঁজছে। এই ক্লিনিকে কিছু একটা গোপন কাজ চলছে। সুমিত মনে মনে ভাবল যদি শুধুনাথ তাকে সাহায্য না করে, তাহলে শুধুনা থকে সুমিত অন্যভাবে বুঝিয়ে দেবে যে, সে সব কিছু বুঝে গেছে যে এই ক্লিনিকে কি কাজ হয়, এবং তাকে সাহায্য না করবার পরিণামটাও ভাল হবে নয়।।
শম্ভুনাথ চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেন। তার শার্টের হাতা গুটানো, কপালে ঘাম। তিনি ফার্মেসির ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ ব্যস্ত আছি। কেউ প্রেসার চেক করতে এলে তুমি দেখে নিও। আমি একটু বেরোব।' ভদ্রলোক সুমিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উনি অনেকক্ষণ ধরে আপনার জন্য বসে আছেন।' শম্ভুনাথ সুমিতের দিকে তাকালেন, চোখে অধৈর্য ভাব। 'কী চাই?'

সুমিত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, ফাইলটা হাতে ধরে বলল, 'স্যার, আমি একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি থেকে এসেছি। আপনার সঙ্গে অল্প কথা বলতে চাই। চেম্বারে বসে বলতে পারি?' শম্ভুনাথের কপালে ভাঁজ পড়ল। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, চোখে একটা অস্থিরতা। সুমিতের মনে হলো, শম্ভুনাথ চিন্তায় পড়ে গেছেন। হয়তো তিনি ভাবছেন, চেম্বারে মেয়েটি আছে, এখন কীভাবে সুমিতকে ভেতরে নিয়ে যাবেন? এইমাত্র অ্যাবরশনের কাজ শেষ হল, আর তিনি চান না কেউ তা দেখুক।

সুমিতের মাথায় আরও চিন্তা ঘুরতে শুরু করল। যদি শম্ভুনাথ তাকে চেম্বারে না নিয়ে যান, তাহলে কোথায় কথা বলবে? বাইরে, এই ধুলোমাখা বেঞ্চে? না, তা হবে না। তার কোম্পানির ওষুধের তালিকা, বিক্রয়ের পরিকল্পনা এসব সবার সামনে বলা যায় না। ক্লিনিকের পাশে একটা ছোট চায়ের দোকান আছে, কিন্তু সেখানে বসে কথা বলা কি ঠিক হবে? নাকি কাছাকাছি কোনো গাছতলায়? সুমিতের মনে হলো, শম্ভুনাথ তাকে আজ কথা বলার সুযোগ দেবেন না। হয়তো বলবেন, 'কাল এসো।' তার বুকটা ধক করে উঠল। এই চাকরিটা তার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ! যদি আজ কথা না হয়, তার বস কী ভাববেন? সে কি আরেকটা সুযোগ পাবে? শম্ভুনাথ কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর হঠাৎ বললেন, 'ঠিক আছে, ভেতরে আসুন।' সুমিতের মাথায় যেন বাজ পড়ল। ভেতরে? এখন? মেয়েটি তো ভেতরে আছে। হয়তো চেম্বারে আরেকটা কক্ষ আছে, যেখানে মেয়েটি শুয়ে আছে। নয়তো শম্ভুনাথ এতটা নির্লজ্জ যে সবকিছু যেনে শুনে সুমিতকে ভেতরে ডাকছেন। সুমিতের মন অস্থির হয়ে উঠল। সে কী দেখতে যাচ্ছে? তার হাতে ফাইলটা শক্ত হয়ে আঁকড়ে রইল। সে ভাবল, হয়তো এই ক্লিনিকে এমন কিছু হয়, যা কেউ জানে না। তার বুকের ধুকপুকানি বাড়ল। সে ধীরে ধীরে চেম্বারের দরজার দিকে এগোল।

দরজাটা পুরনো কাঠের, রং খসে গেছে, হাতলে মরচে। সুমিত দরজা খুলতেই একটা ঠান্ডা বাতাস তার মুখে লাগল। চেম্বারটা ছোট, দেয়ালে ফাটল, একটা পুরনো সিলিং ফ্যান ধীরে ধীরে ঘুরছে। বাঁদিকে

একটা অদ্ভুত চেয়ার। চেয়ারটা ধাতব, পুরনো চামড়ার কভার ছিঁড়ে গেছে। মাথার কাছে একটা কুশন, দুপাশে হাতল, পায়ের কাছে একটা লিভার। চেয়ারের পাশে একটা ছোট ট্রে, তার ওপর ধাতব যন্ত্রপাতি ছোট ছোট প্লায়ার, একটা অদ্ভুত ক্লিপ। মাথার ওপর একটা বড় বাতি, যার আলো মেয়েটির মুখে পড়ছে।

মেয়েটি চেয়ারে শুয়ে আছে। প্রথমে সুমিত লজ্জায় ওদিকে তাকাল না, কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে ধীরে ধীরে তার দিকে তাকাল এবং দেখতে পেল যে মেয়েটির মুখে একটা ধাতব ক্লিপ, যেন মুখটা খোলা রাখার জন্য। তার চোখে একটা কষ্টের ছায়া, হাত দুটো চেয়ারের হাতলে শক্ত হয়ে আঁকড়ে আছে। তার সালোয়ারের কোণে মলিন দাগ, প্লাস্টিকের ব্যাগটা চেয়ারের পাশে পড়ে আছে। তার মুখ ফ্যাকাশে, ঠোঁটে একটা নীরব যন্ত্রণা।

সুমিতের মাথায় এখনও অ্যাবরশনের ধারণা ঘুরছে, যতক্ষণ না অবদি তার চোখ গিয়ে পড়ল চেয়ারের পাশে রাখা একটি ট্রেতে। সেখানে একটা রক্তমাখা দাঁত। তার মাথায় হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। দাঁত? বিষয়টি দেখে সুমিত যেন কিছুক্ষনের জন্য থেমে গেল। তার মনে পরে গেল ক্লিনিকে ঢোকার সময় সাইনবোর্ডে ডাক্তারের নামের পাশে আরও অনেক কিছু সঙ্গে 'দন্ত চিকিৎসক' লেখাটাও ছিল।
সুমিতের মুখ লাল হয়ে গেল। মেয়েটি গর্ভবতী নয়। সে এখানে দাঁত ফেলতে এসেছে। হাফপ্যান্ট পরা ছেলেটি হয়তো তার ভাই বা কেউ, ব্যথার ওষুধ খুঁজতে গিয়েছিল। এই চেয়ারটা একটা ডেন্টিস্টের চেয়ার। শম্ভুনাথ কোনো গোপন কাজ করছেন না। সুমিত মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল, মেয়েটির চোখ বোজা। তার মলিন কাপড়, তার নীরব ধৈর্য সব মিলিয়ে যেন একটা জীবনের গল্প বলছে। সুমিত লজ্জায় মেয়েতির দিকে আর তাকাতে পারল না। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে সুমিত শম্ভুনাথের টেবিলের সামনে থাকা চেয়ারে গিয়ে বসলো। সে কি করে কথা শুরু করবে সব যেন তার মধ্যে গুল পাকিয়ে গেল।

শম্ভুনাথ সুমিতের কথা শুনলেন, কিন্তু তার মুখে অধৈর্য ভাব। 'দেখি, পরে বলব', বলে তিনি চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেলেন। সুমিত বাইরে এসে দাঁড়াল। তার মন ভারী। মেয়েটির মুখটা তার চোখে ভাসছে তার ক্লান্ত চাহনি, তার শরীরের অসমতল গতি যেন একটা অদৃশ্য যুদ্ধের গল্প বলছে। সুমিত ভুল করেছে। তার ক্ষমতা, যাকে সে এত গর্ব করে, তাকে ভুল পথে নিয়ে গেছে। কালীপুরের ধুলোমাখা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুমিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মানুষকে বোঝার জন্য শুধু চোখের দৃষ্টি যথেষ্ট নয়। তার আরও শিখতে হবে। মানুষকে নিয়ে Pre Judgement করবার আগে তাকে এখন শতবার ভেবে নিতে হবে।

## চাঁদের কাছে চাওয়ার ছিল

দৃপ্ত নাথ

একমুঠো পূর্ণিমার আলো,
চাঁদের কাছে চাওয়ার ছিল।
মোমের বাতি নিভিয়ে দিয়ে,
আমার ঘরে অন্ধকারে,
নতুন বীণার নতুন তারে,
নতুন গানের নতুন ছন্দে,
নতুন সুরে সুর মেলাবো,
সেই আলোকে সঙ্গী করে।
অন্ধকার আজ বাড়বে যত,
আলো আমার জাগবে ততো।
নাচবে আলো, গাইবে আলো,
আমার বীণার সুরটি ধরে।
আলো, আমি দুজন মিলে,
সুরে সুরে রাত কাটাবো,
নতুন গানের জন্ম দেবো,
সেই বীণাতে বারে বারে।
যখন আমি ক্লান্ত হব,
বলবে আলো, ঘুমিয়ে পড়ো,
রাখবো মাথা আলোর কোলে,
স্বপ্ন দেখার শেষের পারে।
সেই চাওয়াকে করতে পূরণ
যখন তাকাই আকাশ পানে,
বলবো ভেবে চাঁদকে ডাকি,
একটি কথা নেবে কানে?
চাঁদও তখন রাজি হয়ে,
কান বাড়িয়ে শুনতে যাবে
কিন্তু আবার এ কি হল,
হঠাৎ আকাশ ঘন কালো
অন্ধকারে ঢেকে গেল,
মেঘেরা সব ছুটে এসে
দাঁড়িয়ে গিয়ে চাঁদকে ঘিরে,
পূর্ণিমাকে কেড়ে নিল।
আমার চাওয়ার একার ঘরে,
হয়তো এটাই পাওয়ার ছিল।
হয়তো ঘন অন্ধকার,
আজ-চাঁদের কাছে চাওয়ার ছিল।

# স্রোতের প্রতিকূলে

সুকান্ত দাস

স্রোতের অনুকূলে তো নদীও আপন বেগে বয়ে চলে,
আর স্রোতের প্রতিকূলে নদীও থেমে চলে।

অনুকূলে তো সবাই ভালোবাসতে পারে,
আর প্রতিকূলে বেশিরভাগ ভালোবাসাই হারে।

অনুকূলে সবাই বলে আমি শুধুই তোমার,
আর প্রতিকূলে বেশিরভাগই পারেনা এক সাথে বাকী
জীবন করতে পার।

অনুকূলে কতইনা প্রতিশ্রুতি থাকে,
আর প্রতিকূলে সব সময়ই একে অপরকে হারানোর
ভয় থাকে।

অনুকূলে থাকলে মনে হয় ভালোবাসা কত সহজ,
আর প্রতিকূলে থাকলে ভালোবাসার মানুষটাকে
পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করতে হয় নিরলস। অনুকূলে
থাকলে মনে হয় ভালোবাসা সত্যিই
সুন্দর, আর প্রতিকূলে অনেক সময়েই ভালোবাসার
মানুষটা হয়ে যায় পর।

অনুকূলে তো ভালোবাসার মানুষটার হাত শক্ত করে
ধরা হয়, আর প্রতিকূলে বেশিরভাগই ভালোবাসার
মানুষটার শুধুমাত্র স্মৃতি রয়।
যদি ভালোবাসো অনুকূল আর প্রতিকূল দেখে নয়,
এমন ভাবে ভালোবাসবে তোমার মানুষটা যেন
সারাজীবনের জন্য তোমার হয়।

# সুচরিতা, চিরপরিচিতা

সুদীপ্ত চক্রবর্তী

উজ্জয়িনীর শিপ্রা নদীর তীরে, মল্লিকা, মালতী,
যূথিকার ভারে সুচরিতা, দেখেছি তোমাকে আমি
সেই ফুলশাখে।
সেই এলোমেলো চুলে, চরণে নুপুরের গুঞ্জন তুলে,
হাতের কঙ্কন বাজিছে রিনিঝিনি, সম্মুখে বহিছে
স্রোতস্বিনী।
সেই চকিত চাউনি, চিরপরিচিতা তুমি, সুচরিতা।
গোধূলির শান্ত বেলায়, আকাশে আবিরের রঙের
খেলায়, তুমি চলেছ, ওগো অপরূপিণী, বাতাসে
উঠিছে হিল্লোল রাগিণী।
পুষ্পের ধুলায় গোড়ায়, অবনত লজ্জায়, সুচরিতা,
তোমার স্নিগ্ধ লীলাময়।
যে হাসিতে ফুল ছড়ায়, সে ফুল কি তরুতে শোভা
পায়?
তুমি চিরঅম্লানে বিধাতার দান, চিরপরিচিতা
সুচরিতা।
সন্ধ্যা নেমেছে ধরণীর বুকে, চাঁদ জেগেছে
আকাশের শূন্যে,
মৃদুমন্দ হাওয়া বহিছে,
নদীর বুকে লহরী জেগেছে।
জলপরীরা চন্দ্রকিরণে যেন ঢেলেছে রূপের বান।
নিমিষে হলো তা ম্লান,
সুচরিতা, তোমার রূপের আরশিতে-তোমার
উপমা শুধু তুমিতে।
ফুলঝরা হাসিতে, সেই চিরপরিচিতা তুমি মোর
সুচরিতা।

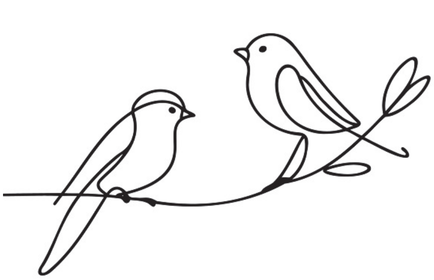

## সেই মেয়েটি

বিশাখা অধিকারী

সেই রাতে যে মেয়েটি অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে
চলে গেলো।
কে রাখে তার খোঁজ?
রাত দখলের আহ্বান করেছে কি কেউ?
আলো জ্বলেছে ঝিলের ধারে?
কয়লক্ষ ক্যামেরার ফ্ল্যাশ পড়েছে যাদবপুরের
চৌহদ্দিতে?
কেউ কি রাখে তার হিসেব!
বলতে বলতেই
মনে পড়ছিলো আসামের সেই গৃহপরিচারিকা
মুন্নিদিদির কথা।
কোথায় মুন্নি?
কোথায় বাবুদের বাড়ির সেই শিশুটি?
কোথায় রবিবাবুর সেই কদম ফুলের গাছ?
নীরব সাক্ষী গাছটি জীবিত আছে কি আজও?
বরাকের জল আজ বিপদ সীমার উপরে বইছে।
পুজোর মরশুম,
কবির শহরে অসম্ভব ব্যস্ততা।
অপহরণ, ধর্ষণ, হত্যা, নির্যাতন-
নারীবাদের কন্টেন্ট আর ডলারের ভীড়ে
ওসব হ্যাশট্যাগ মানায় না।
যদি রীচ ডাউন হয়!

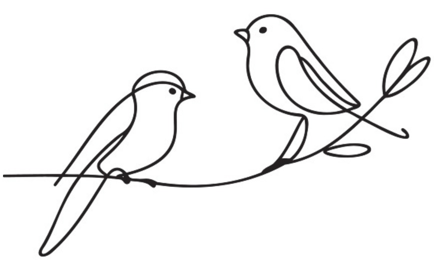

## জিতে গিয়েও, হেরে যাওয়া...

অনিন্দিতা দেবনাথ

মাঝে মাঝেই কিচ্ছু ভালো লাগে না..
বিগত ২৮ বছরের পাশ-ফেলের দৌড় প্রতিযোগিতায়, জিতে গিয়েও হেরে গেছি.... মনে হয়!
বাড়ির উঠোন ছেড়েছি, আজ প্রায় দশ বছর।
বাবার ঘরে, টিভির পর্দা বরাবর রাখা.. সেগুন গাছের তৈরী সোফাটা, ধরেই নিয়েছে... বাড়ির কনিষ্ঠতম সদস্যা মারা গেছে।
মৃত সদস্যার গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দের অভাব টুকু কাটিয়ে উঠেছে বাড়ির আসবাবপত্র।

শুধু তাই নয়.. এখন বাড়ি গেলে, অতিথিরূপে আমায় স্বাগত জানানো হয়... ঠাকুমার নড়বড়ে বিছানায়, একটা নতুন সুগন্ধিযুক্ত চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়.। বাক্স থেকে একটা মাথার বালিশ এবং একখানা পাশ বালিশ বের করে, রোদ মাখানো হয়...
ব্যাগ ভর্তি শাক- সবজিও আসে..
ইলিশের দাম আকাশছোঁয়া হলেও, দরাদরি হয়না!
রান্নাঘরের, মিটসেফে.. পলিথিন জড়ানো কাঁসার থালা বের করে, তার খাতির- যত্নও হয়।

আমি বোধ করি...এ তো নিজের বাড়ি নয়, সাক্ষাৎ হোটেল!
গেস্ট আসার আগেই, হোটেল সাজানো হয়...
হোটেলের সমস্ত দূর্বলতা, গেস্টের চোখ থেকে আড়াল রাখার এক আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়..

বছরে এক- দুবার গেস্ট আসে... আবার চলেও যায়..
পড়ে থাকে, ব্রিফকেস ভর্তি আফসোস!


এখানে উন্নতমানের বিভিন্ন ধরণের দেশী এবং বিদেশী গাছের চারা, বীজ ইত্যাদি পাওয়া যায়।

(কৃষি বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত উত্তর ত্রিপুরার সর্বপ্রথম নার্সারী।)

BREEDER NURSERY &
CONSERVATION CENTRE

পদ্মবিল, পানিসাগর, উত্তর ত্রিপুরা।

মোবাইল নং : 7432831008

## ব্যাকডেটেড

দীপাঞ্জন পাল

আর ভালো লাগে না এভাবে বন্দী থাকতে। দেখতে দেখতে অনেক বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু এই কাঁচের ঘর থেকে মুক্তি মেলেনি আমার আজও। ঘোলাটে কাঁচের দরজা ভেদ করে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম ঢাকঢোল বাজিয়ে একদল ছেলেমেয়ে মা দুর্গার মূর্তি নিয়ে যাচ্ছে নাচতে নাচতে। হঠাৎ মনে পড়ল আজতো মহাষষ্ঠী। আগে আজকের দিনে আমি নতুন সাজে সেজে উঠতাম। আমায় ঘর থেকে বের করে নানা রকম জিনিসে, নানা রকম নকশায় সাজিয়ে তোলা হতো যার যার অভিরুচি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মাপে। আমারও বেশ লাগতো আলাদা আলাদা সাজে সাজতে। কখনো আপত্তি করিনি তাই।

সেজেগুজে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত হইহই করে ঘুরে বেড়াতাম শহরে, গ্রামে পুজোর প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে। দিনরাত এক করে মজা করে ঘুরে বেড়াতাম। আট থেকে আশি সকলকে জড়িয়ে ধরে ঘুরে বেড়ানোই ছিল আমার কাজ। আমার গায়ের নতুন গন্ধে নিজেদের আনন্দের ঠিকানা খুঁজে পেত সবাই।

ধীরে ধীরে আমার সুখের দিন ফুরিয়ে এলো। ঠাঁই হলো ছোট্ট এই কাঁচের ঘরে। তারপর থেকে কত দূর্গাপূজো এলো আবার চলেও গেলো। কিন্তু আমার বন্দী দশা ঘুচলো না। আমি নাকি ব্যাকডেটেড হয়ে গেছি। এখনকার ট্রেন্ড অনুযায়ী আমি তাই বাতিলের খাতায়। অথচ আমার পরে এসেও সেদিনকার রংবেরঙের ছেলেছোকরার দল দিব্যি বাজারে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা পুজোর আগেই সেজেগুজে চলে আসে। আমার মতো ওদেরকে সাজানোর জন্য বাড়তি সময় ব্যয় করতে হয় না। ওরা জন্ম থেকেই একেবারে ঝাঁ চকচকে। ওদেরকে আলাদা ভাবে সাজিয়ে তোলার প্রয়োজন পড়ে না। সময়ের চাহিদা মেনে ওরা আগে থেকেই তৈরি হয়ে আসে বাজারে। ওদের কদর আমার থেকে অনেক বেশি। আর যত দোষ শুধু আমার বেলায়।

এখন আর কেউ ফিরেও তাকায় না আমার দিকে। কতবছর হলো দর্জিকাকার সাথে দেখা হয় না আমার। মন খারাপ করে একা একা পড়ে থাকি এই ছোট্ট কাঁচের ঘরে। কেউ একবার ভাবেওনা আমায় নিয়ে। অথচ আগে আমায় ছাড়া শুধু দুর্গাপুজো কেন, কোনো অনষ্ঠানই ভারতে পারাতা না কেউ। আর আজ সেই আমিই রঙিন চকচকে রেডিমেড জামা কাপড়ের ভিড়ে অবহেলায় দোকানের কোণে পড়ে থাকা ব্যাকডেটেড কাপড়ের একটা টুকরো। দোকানের তাকে পড়ে থাকতে থাকতে ধুলো জমে গেছে আমার ভাঁজে। যখন নতুন কেউ দোকানে আসে তখন এক বুক আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকি তাদের দিকে। ভাবি, হয়তো এবারে আমার মুক্তি হবে। এবারে হয়তো আমি যেতে পারবো দর্জিকাকার দোকানে আবারো। মন মাতানো নকশায় দর্জিকাকাও সাজাবে আমায়। কিন্তু প্রতিবারই আমার মন ভেঙে দিয়ে আমার পাশেই সেজেগুজে থাকা রেডিমেড জামাটা হাতে করে হাসিমুখে নিয়ে যায় সকলে। আমি পড়ে থাকি নীরবে আড়ালেই। এখন বেশ বুঝতে পারি যে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে একেবারেই। আর কেউ আমায় কোনোদিনই এখান থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে না। অযত্নে অবহেলায় ধুকতে ধুকতে একদিন আমার ঠাই হবে আস্তাকুঁড়ে। দর্জিকাকা আমায় হয়তো ভুলেই গেছে এতদিনে।

হঠাৎ আমার চিন্তায় ছেদ পড়লো 'দূর্গা মাইকি, জয়' ধ্বনিতে। ঢাকের তালে কোমর দুলিয়ে মায়ের কাঠামো নিয়ে বিসর্জনের জন্য বেরিয়ে পড়েছে সকলে। আজ বিজয়া দশমী। ভাবতে ভাবতে তিন দিন কেটে গেলো তবুও ভাবনার শেষ হয় না। এত মন খারাপ, এত অনিশ্চয়তার ভিড়েও বারবার বেহায়া আশাগুলো মনের কোণে উঁকি দেয় বেয়াড়ার মতো। কে জানে হয়তোবা ''আসছে বছর আমার হবে।''

# আধুনিক যুগে যোগ ও ধ্যানের গুরুত্ব

প্রসেনজিৎ দেবনাথ,অঙ্কন সিনহা, সুকান্ত চন্দ্র নাথ, প্রিয়জিৎ দেবনাথ

বর্তমান যুগকে বলা হয় আধুনিক যুগ বা ডিজিটাল যুগ। মানুষের জীবনযাত্রা দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। প্রযুক্তি, নগরায়ণ, শিল্পায়ন, প্রতিযোগিতা এবং ব্যস্ততার কারণে মানুষ ক্রমশ শারীরিক ও মানসিক চাপের মধ্যে পড়ছে। আধুনিক জীবনের এই প্রতিযোগিতা, অস্থিরতা এবং চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্যতম পথ হলো যোগ ও ধ্যান। যোগ ও ধ্যান কেবল প্রাচীন ভারতের সম্পদ নয়, বরং আজ বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) আজ সুস্বাস্থ্যের সংজ্ঞায় শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতাকে গুরুত্ব দিয়েছে। যোগ ও ধ্যান এই তিন ক্ষেত্রেই ভারসাম্য আনে। আধুনিক যুগে যোগব্যায়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যস্ততা, মানসিক চাপ, অনিয়মিত জীবনযাপন ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে মানুষের জীবন ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে যোগব্যায়াম শুধু শারীরিক নয়, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

১. **যোগ ও ধ্যানের সংজ্ঞা** - যোগ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ‘‘যুজ’’ ধাতু থেকে, যার অর্থ সংযোগ বা একত্রিত হওয়া। অর্থাৎ যোগ হলো শরীর, মন ও আত্মার সমন্বিত সাধনা। এটি শরীরচর্চা, শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ (প্রাণায়াম) এবং আসন প্রভৃতির মাধ্যমে সাধিত হয়। ধ্যান হলো মনকে একাগ্র করা ও অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে মন শান্ত হয়, দুশ্চিন্তা দূর হয় এবং একাগ্রতা বাড়ে।

২. **আধুনিক যুগের জীবনধারা ও সমস্যা** - আধুনিক সমাজে মানুষ নানা ধরনের সমস্যায় জর্জরিত। যেমনঃ চাপ ও মানসিক উদ্বেগ - প্রতিযোগিতার দৌঁড়ে মানুষ সারাক্ষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। শারীরিক অসুখ, অনিয়মিত জীবনযাপন, জাঙ্ক ফুড, ব্যায়ামের অভাবে ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, স্থূলতা, হৃদরোগ বেড়েছে। ঘুমের সমস্যা, স্ট্রেস ও অতিরিক্ত কাজের কারণে অনিদ্রা বাড়ছে। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, প্রযুক্তি মানুষকে কাছাকাছি এনেছে আবার দূরেও সরিয়ে দিচ্ছে। মানসিক অস্থিরতা, রাগ, হতাশা, উদ্বেগ, বিষণ্ণতা ইত্যাদি বেড়ে যাচ্ছে। এই সমস্যাগুলো সমাধানে ও সুস্থ জীবনের পথে যোগ ও ধ্যান কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

৩. **শারীরিক স্বাস্থ্যে যোগের গুরুত্ব** - রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, নিয়মিত যোগাভ্যাস শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায়। শ্বাসযন্ত্র ও রক্তসঞ্চালন উন্নত করে, প্রাণায়াম ফুসফুসকে সুস্থ রাখে এবং রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি করে। হৃদরোগ প্রতিরোধে সহায়ক, যোগ রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে। ওজন নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন আসন শরীরকে ফিট রাখে ও অতিরিক্ত চর্বি কমায়। লচকতা ও শক্তি বৃদ্ধি করে, আসন অনুশীলন পেশি ও হাড়কে মজবুত করে।

৪. **মানসিক স্বাস্থ্যে ধ্যানের গুরুত্ব** - স্ট্রেস কমায়, ধ্যান স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত করে ও মনের অস্থিরতা দূর করে। একাগ্রতা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে, ছাত্রছাত্রী ও কর্মজীবী মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিষণ্ণতা ও উদ্বেগ কমায়, মানসিক রোগ নিরাময়ে ধ্যান বিশেষ কার্যকর। আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, রাগ, হতাশা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করে, মনের স্বচ্ছতা ও ইতিবাচক চিন্তা বাড়ায়।

৫. **সামাজিক জীবনে যোগ ও ধ্যানের ভূমিকা** - যোগ ও ধ্যান মানুষকে শান্তিপূর্ণ, সহনশীল ও ইতিবাচক করে তোলে। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। সহমর্মিতা ও সহানুভূতির

বিকাশ ঘটে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হয়।

৬. **শিক্ষাক্ষেত্রে যোগ ও ধ্যানের প্রয়োজন** - আজকের দিনে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার চাপ, পরীক্ষা ভীতি ও প্রতিযোগিতার কারণে মানসিক চাপে ভোগে। নিয়মিত যোগ ও ধ্যান করলে; একাগ্রতা বাড়ে, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, পরীক্ষার ভয় কমে, আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে।

৭. **কর্মক্ষেত্রে যোগ ও ধ্যানের প্রয়োজন** - অফিসের চাপ, টার্গেট পূরণ, দীর্ঘ সময় কাজ করার কারণে কর্মীরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। যোগ ও ধ্যান করলে; কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়, মানসিক চাপ কমে, সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত হয়, কাজের পরিবেশ আরও ইতিবাচক হয়।

৮. **যোগ ও ধ্যানের বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতা** - আজ আন্তর্জাতিকভাবে ২১ জুন দিনটি 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' হিসেবে পালিত হয়। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই মানুষ যোগ ও ধ্যানকে স্বাস্থ্যসচেতন জীবনের অংশ করে তুলেছে। গবেষণাতেও প্রমাণিত হয়েছে যে নিয়মিত যোগ ও ধ্যান মানসিক শান্তি ও দীর্ঘায়ুর জন্য অত্যন্ত উপকারী।

৯. **মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি** - ধ্যান ও প্রাণায়ামের মাধ্যমে মনোযোগ, একাগ্রতা এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, যা ছাত্রছাত্রী ও কর্মজীবী মানুষের জন্য বিশেষ উপকারী।

১০. **ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করা** - যোগব্যায়াম শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, ফলে সহজে রোগ সংক্রমণ হয় না।

১১. **জীবনযাত্রায় শৃঙ্খলা আনা** - যোগের মাধ্যমে মানুষ নিয়মিত জীবনযাত্রার অভ্যাস গড়ে তোলে। ভোরে ওঠা, শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস; এসব জীবনে শৃঙ্খলা আনে।

১২. **আধ্যাত্মিক উন্নতি** - যোগ শুধু শরীরের নয়, মনেরও সাধনা। এটি মানুষের অন্তর্নিহিত শান্তি, আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচক চিন্তাধারা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

**উপসংহার** - আধুনিক যুগে যোগব্যায়াম হলো সুস্থ ও সুষম জীবনের চাবিকাঠি। প্রযুক্তি ও ব্যস্ততার দৌড়ে মানুষ যেখানে ক্রমশ মানসিক ও শারীরিক সমস্যার মধ্যে পড়ছে, সেখানে যোগব্যায়ামই হতে পারে মুক্তির পথ। আধুনিক যুগের ব্যস্ততা, দৌড়ঝাঁপ, মানসিক চাপ ও অসুস্থ জীবনযাপনের মধ্যে যোগ ও ধ্যান এক অনন্য সমাধান। এটি কেবল শরীরকে সুস্থ রাখে না, বরং মন ও আত্মাকে শান্ত করে। শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক তিন স্তরেই যোগ ও ধ্যান মানুষের জীবনে সমতা আনে। তাই বলা যায়, 'যোগ ও ধ্যান শুধু ব্যায়াম নয়, এটি এক জীবনদর্শন, যা আধুনিক যুগের মানুষের জন্য অপরিহার্য।'

## ছোট মুখে বড় কথা

[ শিশু নাটক ]

রণজিৎ পুরকায়স্থ

(সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু পথশিশু, যারা অনাথ বা পারিবারিক বিশৃঙ্খলায় ছিন্নমূল হয়ে এটি ভাঙা পরিত্যক্ত গ্যারেজে আশ্রয় নিয়েছে। এরা কেউ কাজ করে রেস্টুরেন্ট-এ, কেউ মানুষের বাড়ি, কেউ বা ভিক্ষা করে। জীবনের অভিজ্ঞতায় এরা বয়সের তুলনায় প্রবীন। অর্থ বা লোকবল না থাকলেও প্রাণ প্রাচুর্যে পূর্ণ। পরিত্যক্ত এই গ্যারেজটিই তাদের প্রাণের আস্তানা, তারা পটলী, বল্টু, ঘন্টু, দেড় ব্যাটারী, হান্টার, লক্ষী, সাবিত্রী, ময়না)।

(রাতের দৃশ্য। সবাই ঘুমাচ্ছে বা উদ্যোগ নিচ্ছে। বল্টুর নাক ডাকায় এদের ঘুম আসেনা। ময়না নিয়ে চুপি চুপি দেখে যে বল্টু ভেসে ভেসে ঘুমাচ্ছে, শুরন্ন হয় তার উপর অত্যাচার।)

বল্টু - হই কে আমার চুলও টানছে রে (সবাই ঘুমায়)। যদি ধরতে পারি রে বাচ্চাইন টের পাওয়াইমু।

নয়না - ও মাইগো কে আমার চুল ছিঁড়ি লাইলো গো, হই কোনটায় রে। (সব দৌড়ে আসে, ঘুম থেকে উঠার ভান করে)

সবাই - কিতা হৈছে রে বল্টু

বল্টু - তোরা কৈ আছলে ?

সবাই - আমরা তো ঘুমো

বল্টু - মিছা মাত মাতবে না কইলাম, সবটি বাইরো আমার গ্যারেজ থাকি।

ময়না - তোর গ্যারেজ ? (সবাই হাসে) ভাঙা গ্যারেজ কই থাকি খুঁজিয়া পাইছলে

বল্টু - আমি তো আইন্যা জেগা দিছলাম, নাইলে এক একটা ফুটপাত খোলা আকাশের নীচে ঘুমাইতায়।

সবাই - অয় রে ভাই তুই যে উপকার করছস।

লক্ষী - আর আমি যে তোর গার গন্ধ, আর বায়ুর গন্ধ সহ্য করিয়া আছি, ওটাউ তোর ভাইগ্য।

সবাই - নারে বা তুই বিরাট ব কাজ করছস, আয় বো

ময়না - তোর পা টিপিয়া দেই,

হান্টার - তোর মাথা টিপিয়া দেই

সাবিত্রী - তোর হাত টিপিয়া দেই (হাত টিপতে যায়, চিৎকার করে বল্টু)

সবাই - কিতা হইছে, কিতা হইছে।

বল্টু - আজকে রেস্টুরেন্টও প্লেইট ধোওয়ার সময়, একটা পড়িয়া ভাঙছিল, এর লাগিয়া মালিকে কড়াই থাকিয়া গরম ছেনি আনিয়া লাগাইদিছে। (Sad music)

পটলা - কিতা অত বড় সাহস। মালিকরে একটা শিক্ষা দেওয়া লাগবো, চল দোকান - উকান ভাঙিয়া আইমু।

সবাই - চল চল।

ময়না - দাঁড়া, তারা কাজ দেয় দেখিয়া আমরা খাইয়া বাঁচিয়া আছি

ঘন্টু - শুন অতো কম পয়সায় তারা লোক কই পাইতো ?

ময়না - দাঁড়াও, এমনে হইতো নায়, তারারে অইন্য রকম শিক্ষা দিমু।

(তারা যুক্তি করে, নেপথ্যে গান বাজে)

গান

ছোট মুখে বড় কথা / বলবো বলবো / হ্যাঁ হ্যাঁ বলবো
বড়দের ভুল / কেন আমরা মুখ বুজে সইবো ? সইবো সইবো তাইতো বলবো।
সবাই - Action
(রেস্টুরেন্টে দৃশ্য বল্টু আজ আসেনি তাই মালিক একা।)
মালিকনি - আজ সারাদিন একা একা রেস্টুরেন্ট চালিয়ে পরিশ্রম হয়ে গেছে। হারামজাদা বল্টুটাও আসেনি। কাল আসুক উচিত শিক্ষা দেব।
(রেস্টুরেন্টের মালিক দোকান বন্ধ করে ভূতের হামলা)
প্রথম ভূত - এই দে দিদিমনি কোথায় যাচ্ছ ?
মালিকনি - কে ভূত ? ভূ ভূ ভূ ত
ভূত-২ - আমি ভূতের বাবা ব্রহ্মদত্তি
মালিকনি - ভূত
ভূত-৩ - আমি শাকচুন্নি, ভূতের মা।
মালিকনি - তোমরা কেন এসেছো ? (কান্না)
ভূত-৪ - আমি মামদোভূত
মালিকনি - কি চাও তোমরা ?
সবাই - তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত
মালিকনি - পাপ। আমি কি পাপ করলাম ? এই তো সেদিন হরিনাম সংকীর্তনে ১০ হাজার টাকা চাঁদা দিলাম।
সবাই - মানুষকে মেরে হরিনামে টাকা বিলিয়ে কি হবে রে ?
মালিকনি - কেন আমি আবার কাকে মারলাম ?
ভূত-২ - কেন বল্টু ? ও কি দোষ করেছিল ? তোর বাচ্চা ঘরের কিচু ভাঙে না ?
মালিকনি - ব ব বল্টুকে, বল্টুকেও চিনো তোমরা ?
সবাই - আমরা উপর থেকে সব দেখি।
সবাই - বল বল্টুকে কেন হাতে ছেঁকা দিয়েছিলি, (সবাই গলা টিপে ধরতে যায়)
মালিকনি - আ - আ - আ - আ (চিৎকার), ও বাবা ভূত, ও মা ভূত, ও পুঁচকে ভূত, আমি জীবনেও করবো না, আমাকে এবারের মতো মাপ করে দাও।
ভূত - ১ - তাহলে কাল থেকে বল্টুকে চিকেন বিরিয়ানি প্রতিদিন ১ প্লেইট খাওয়াবি ?
মালিকনি - খাওয়াবো, ১ প্লেইট নয় যত প্লেইট চাইবে ততো প্লেইট। ও যতো প্লেইট...
ভূত-২ - তাহলে (সকলের মাথা গুনে) ৭ পেস্নট দিয়ে দিবি।
মালিকনি - ৭ প্লেইট ! (ভয় পেয়ে) দেবো। দেবো।
ভূত-৩ - বাসন ভাঙলে ?
মালিকনি - কিচ্ছু বলবো না। কিচ্ছু না। সব ভেঙে ফেলুক।
ভূত-৪ - মনে থাকবে ?
মালিকনি - থাকবে মানে ! আমার বাপেরও মনে থাকবে, (বলে পালিয়ে যেতে চায়, পড়ে যায়, আবার দৌড়ায়) লাইট অফ
(পরের দিনের দৃশ্য। দিনের আলো। দোকানে বল্টু বসে বাসন মাজছে। মালিকনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘুরিয়ে

প্রবেশ)
মালিকনি - বল্টু, বাবা বল্টু তোকে আর কোনদিন বাসন মাজতে হবে না। আয়, আয় সোনা (ওড়না দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দেয়) এনে কাছে বসায়, আদর করে।
মালিকনি - মাংস বিরিয়ানি তোর খুব প্রিয়, তাইনা রে। দাড়া। আমি এক্ষুণি নিয়ে আসছি।
(খাইয়ে দেয়, সঙ্গে সাত প্যাকেট প্যাক করে বাড়িতে পাঠায়। হতভম্ব হয়ে বল্টু বোঝেনা কি হলো আজ মালিকের। শুধু জিজ্ঞেস করে -
বল্টু - আপনার পায়ে কি হয়েছে ?
মালিকনি - কিছু না কিছু না। বাথরুমে পড়ে গিয়েছিলাম।
(সাত পেকেট নিয়ে বল্টু তখন মহা আনন্দে তখন মহা আনন্দ, সবাই খেতে থাকে। বল্টু হা করে দাড়িয়ে থাকে, সে কিছুই বুঝতে পারে না। গান বাজে সবাই আনন্দে নাচতে থাকে।

লাইট অফ

দ্বিতীয় দৃশ্য

(গ্যারেজে সবাই বসে গল্প করছে)

হান্টার - কিতা বে ঘন্টু আজকে কেমন কামাই হইলো ?
পটলী - আজকে কে মরছে কইয়া ভিক্ষা করলে ?
ঘন্টু - না বে আজকে মরা নায়। নতুন আইটেম।
সবাই - নতুন আইটেম ?
ঘন্টু - বাবার পাও ভাঙি গেছে, চিকিৎসা করাইতাম
ময়না - তে মানুষে দিল নি তোর বাবার চিকিৎসার খরচ ?
ঘন্টু - দাঁড়া গনি লই, (ভিক্ষা পাত্র থেকে পয়সা গুনে)
ইতা বেটা হসপিটাল নেওয়ার টুকটুক ভাড়া
সবাই - (হাসি)
ময়না - তুই তোর বাবারে দেখছসনি কোনদিন
(Sad Violin)
ঘন্টু - দেখতাম না কেনে ? রোজদিন রাত্রিবেলা, আইয়া না মারে মারতো। আর কথা কইতে পারতো না। কিতা যে খাইয়া আইতো, মাইর খাইতে খাইতে একদিন মা আমার একদিন মরিও গেলো। পুলিশে কিতা লেখিয়া নিলো। সকালে আইয়া। আর বাবাতো ওউ রাইত থাকিয়া নিখোঁজ, আর আমি পাইলামা তোরারে। (কান্না)
ময়না - কান্দিস নারে ঘন্টু। আমরার সবের জীবন এক। বড়রা ভুল করে তার শাস্তি পাই আমরা। তুইতো দুইজনেরই দেখছস কিন্তু, আমি ? জন্মের পরেই দেখলাম মা একলা। বাবা কিরকম হয় বুঝলাম না। একদিন সন্ধ্যার সময় দেখলাম একটা লোক আইলো, আর মা হাসতে লোকটার লগে কই যে গেল আর আইলো না। আমি তাবুর ভিতরে একলা সারা রাইত কানতে কানতে ঘুমাইলাম। সকালবেলা মারে খুঁজতে খুঁজতে যখন পাইলাম না তখন তোরার লগে দেখা। (সবাই কাঁদে) (বল্টুর প্রবেশ)
বল্টু - কিতাবে তোমরা সব কান্দাত লাগি গেছো নি ? রোজ রোজ এক কান্দা কান্দিয়া কিতা করতায়।
লক্ষী - (নাকে ধরে) ইসস বল্টু আইয়াও ছাড়ি দিছস নানি ?

বল্টু - আমি দিসি না
সবাই - বল্টু তুই (নাকে ধরে)
সাবিত্রী - বল্টু এক কাম কর। যখন আইবো ই ক্যুরি ব্যাগ লাগাই দিবে, এরপরে বান্দিয়া বাইরে ফালাই দিবে।
(সবাই হাসে)
হান্টার - ওই দেখ, দেখ (সবাই দেখে একটি লোক লুকিয়ে আবর্জনা ফেলছে)
ময়না - সব আও, (গোপনে পরিকল্পনা চলে, গান বাজে)

(লাইট অফ)

(সবাই বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক এর মুখোশ পরে লোকটিকে ভয় দেখায়, লোকটি পালিয়ে যায়)
হান্টার - তোমরা আবর্জনা ফালাইয়া চাইরোদিকে গন্ধ ছড়াইবায় আর আমরা দরবার করিয়া মররাম।

(লাইট অফ)

তৃতীয় দৃশ্য

(ভোর, মোরগের ডাক, ধীরে ধীরে আলো বাড়ছে। ময়না উঠে গান ধরে, ধীরে ধীরে গলা মেলায় পটলি)
ময়না - ঘরো এক ফোটা জল নাই বল্টুয়ে ইন বইয়া কিতা করে রে (ফন্দী কাঁটে) (দুটি বালতি নিয়ে একটি বল্টুর মাথায় পরিয়ে দেখ অপরটি নিজের)
বল্টু - কে রে
ময়না - কে রে ?
দু’জনে - কে করলো ?
ময়না - তে ঘন্টু আর পটলী
বল্টু - আজকে ঘন্টুরে শিখাইমু।
(ঘরে গিয়ে ঘুমন্ত ঘন্টুকে টেনে উঠায় দুজনে মারামারি লাগে, সবাই আসে)
পটলী - আমরা রান্দা কররাম, তোরা জলের ব্যবস্থা কর
ঘন্টু - চল বন্ধু। (দুই বন্ধু চলে যায়। একটু পরে খালি বালতি নিয়ে ফিরে আসে)
ঘন্টু - ওই পটলী, জল নাইরে
বল্টু - জলের বুলে অখন অভাব। মাইকে কইয়া যার -
‘পানীয় জলের অপচয় করবেন না, না হলে আপনাকে ভবিষ্যতে জলহীন থাকতে হবে।’
ময়না - আমি যে বাড়ি কাম করি, ই বাড়ির ম্যাডামে বাথরুমে ঢুকলে আর বাইর অইন না। মাইগো মাই এক ঘন্টা লাগাইয়া কিতা যে করইন বাথরুমে। আমি ঝাড়, দিয়া, ঘর মুছিয়া, রান্নার জিনিস রেডি করিয়া আইয়া দেখি তাইন তখনও বাথরুমে।
সাবিত্রী - তাইন বাথরুমও গান গাইতা আর আমরা জল না খাইয়া মরতাম
পটলী - দাড়া (Action) হইত নি ?
সবাই - ওয় হইতেই লাগবো।
(বড়লোকের বাড়ি, বাথরুমে স্নান করছেন, গান গাইছেন)
দিদিমনি - ঠান্ডা ঠান্ডা পানি সে নাহানা চাহিয়ে।
(হেরে গলায় গান, ময়না সবাইকে ডেকে পাঠায়)
ময়না - দিদিমনি দরজা খুলুন। (দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই সবাই ঘিরে ফেলে)

বল্টু - আপনি কত সময় ধরে স্নান করছেন ?
দিদিমনি - কেন সে কৈফিয়ত তোমাদের কেন দেব ? তোমরা কারা ?
পটলি - দিদিমনি আপনি যে এতো সময় ধরে স্নান করছেন তা কি ঠিক ?
দিদিমনি - আমার বাথরুম, আমার জল, আমি যত খুশি স্নান করবো।

(গান)

বল্টু - বাথরুম আপনার হতে পারে কিন্তু জলতো সবার।
দিদিমনি - তাই বলে কি আমি স্নান করবো না,
ঘন্টু - নিশ্চয়ই করবেন। বালতি, বালতি ব্যবহার করুন। দুই বালতি জলে ঠিক স্নান হয়ে যাবে, Shower ব্যবহার বন্ধ করুন।
লক্ষী - একটু আমাদের কথা ভাবুন।
দিদিমনি - আরে যা যা
ঘন্টু - এই যে দিদিমনি ভিডিও করা হয়েছে। সব ভিডিও গিয়ে সবাইকে দেখাই।
পটলী - চলরে ঘন্টু ভিডিওটা গিয়ে মানুষকে দেখাই, জল অফিসে গিয়ে বলি।
ময়না - বল্টু কি জানি মাইকে বলছিল।
দিদিমনি - রক্ষা করো, ডিলিট করো এই ভিডিও, আমি আর কোনদিন শাওয়ারে স্নান করবো না।
সবাই - মনে থাকবে, চল সবাই, (বিশেষ ভঙ্গিমায় সবাই দাঁড়ায়)
লক্ষী - বন্ধু তোর মোবাইলটা দেখিতো। (ঘন্টু দেখায় একটি কাঠের টুকরো। সবাই হাসে, লাইট অফ হয় বিশেষ জোন লাইট জ্বলে। কথা ভেসে আসে)
নেপথ্যে - এভাবেই যখন ছোট মুখে বড় কথা চলছিল যখন তারা নিজেদের মতো করে হাসি-ঠাট্টা, দুঃখ মুখের পটোয়ারা কর ভাগ বাটে করছিল তখনই আসে অনিশ্চয়তা, আবার তাদের জীবনে নেমে আসে মারির এ জটি মালিকানা পরিত্যক্ত গ্যারেজটি বদল হয়। নতুন মালিক গ্যারেজটি ভেঙে নতুন প্রসাদ গড়বেন তাই চললো উৎখাত)

লাইট অফ

(সবাই বিষণ্ণ। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে)

ময়না - আরতো ইখানে থাকতে দিতো নারে। (কান্না)
পটলী - ওয় রে ময়না, আবার হয়তো আমরা আলাদা হই যাইমু। (কান্না)
হান্টার - কার দোকানের বারিন্দাত যে জেগা নিতাম
সাবিত্রী - আমি তোরারে ছাড়া কেমনে থাকমু ?
লক্ষী - আমি তো ছোট। আমার কিতা অইব ক।
বল্টু - আমরার Action কিতা বন্ধ হই যাইবো নি ? তে তো আবার..
ঘন্টু - না Action বন্ধ হইতো নায়, যে যেখানো খারাপ কিছু দেখবায় ইখানো আইয়া জমা হইবায়, সব প্রত্যেকদিন কাম সারিয়া আইবায় দেখা করতে।
ময়না - ঠিক কইছোস (মুষ্ঠিবদ্ধ হাত। (গান) ভবিষ্যতে লড়াই চালিয়ে যাবার অঙ্গীকার করে)

<u>যবনিকা</u>